তৃতীয় অধ্যায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নারী চরিত্র

তৃতীয় অধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নারী চরিত্র

সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকে বাংলা কথাসাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি লক্ষ করলে দেখা যায়— ''প্রথম মহাযুদ্ধ উত্তরকালীন সংশয়, দ্বিধা, প্রথাসিদ্ধ অনুশাসনের প্রতি প্রশ্নবিদ্ধ অ-স্বীকার প্রধান হয়ে ওঠেনি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র— এই তিন লেখকের কলমে। তাদের লেখনীতে বাঙালির উনিশ শতকীয় নবজাগরণ সঞ্জাত সামাজিক সংস্কারগুলির স্বীকৃতি ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল সামাজিক ও পারিবারিক গঠনে মনুশাসিত সূত্রগুলিও। তার কারণ মধ্যবিত্ত বাঙালির মনে পারিবারিক বিন্যাসের সেই রক্ষণশীলতা বিশ শতকেও ছিল অনেকখানি অপরিবর্তিত। সামাজিক মনের রক্ষণশীলতা অনেকটাই অনড় ছিল নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিন্যাসের ধারণা সম্পর্কে। নারীকে কিছুটা লেখাপড়া শেখানোর বিষয়ে এই লেখকরা তথাকথিত উদারপন্থী ছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে নারীর কর্মক্ষেত্রে পদক্ষেপ বিষয়ে তাঁরা ছিলেন প্রায় সম্পূর্ণ নীরব। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটি এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকার সংকট সম্পর্কে তাঁদের ভাবনার গতিমুখ আমরা বুঝতে পারি না। নারী সম্পর্কিত উনিশ শতকীয় ধারণাকে আত্মস্থ করেছিলেন মহাযুদ্ধ উত্তরকালীন ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সেই ধারণাটি হল নারী হবে স্বামীনিষ্ঠ, সেবাপরায়ণা, গৃহরক্ষয়িত্রী, এবং সন্তানের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করা জননী। বিভূতিভূষণের নারী ভাবনায় সর্বজয়া ইমেজ খুবই লক্ষণীয়।''[১] বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ, জাতিদাঙ্গা, পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল মানুষের মাটির সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে যাত্রা, সর্বপরি বিশ্বায়নের প্রভাবে সারা ভারতবর্ষের সাথে সাথে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনযাপনের প্যাটান গেছে বদলে। এই বদলে যাওয়া সময়ের ঝড়ো হাওয়াতেও সনাতনপন্থী লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় স্থির, স্থিতধী হয়ে তাঁর কাঙ্ক্ষিত 'সর্বজয়া'দেরই প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করেছেন তার উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলিতে।

(ক) 'ঘুণপোকা'

প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'ঘুণপোকা' সম্বন্ধে লেখক স্বয়ং বলেছেন ''বইখানি যে লিখেছিল

সেই যুবকটির সঙ্গে আমার এখনও মাঝে মাঝেই দেখা হয়ে যায় গড়িয়া হাটায়, কালীঘাটের ফুটপাথে, কলেজস্ট্রিটে বা সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে বা বাসে শীর্ণকায়, ছোট করে ছাঁটা চুল, ঘোর অন্যমনস্ক এবং দিশাহীন চোখ।"[২] যুবক শীর্ষেন্দুর এই দিশাহীনতাই সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর সৃষ্ট শ্যাম চরিত্রে। যুগোচিত এই দিশাহীনতই আবার উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলিকেও অন্য একমাত্রা দিয়েছে। ইতু, লীলা এই নারীচরিত্রগুলির জীবনাচরণ তাদের মনোভঙ্গির মধ্য দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।

ইতু— উপন্যাসের শুরুতে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন প্রেমিকা নারী হিসাবেই ইতু চরিত্রটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তার সেই প্রেমিকা সত্তার পরিচয় আমরা পাই যখন সে সদ্য বেকার যুবক শ্যামের বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে বলে ''হুঁউ। এক্ষুনি। বলতে বলতে ইতুর গলায় খুব আবেগ এসে গেল, মহীয়সী মহিলার মতো শোনাল তার গলা, শ্যাম, আমি ও ছোটখাটো একটা চাকরি করি, তাছাড়া আমার কিছু গয়না আছে। আমাদের দু'জনের...."[৩] এই আবেগ সর্বস্বতাই ইতু চরিত্রের একমাত্র পরিচয় নয়। ইতু চরিত্রের বহুমাত্রিকতার পরিচয় আমরা পাই যখন ইতু বলে ''দি মণিং শোজ দি ডে। কাছে এসো শ্যাম, আমি তোমার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে চাই।"[৪] সেই ইতুই আবার বলে ''আঃ শ্যাম! কাছে এসো।..... তোমার ভয় কী শ্যাম' তুমি অনেক মেয়েকে ছুঁয়েছো, তুমি পাকা লম্পট।"[৫] অর্থাৎ 'তোমাকে জানা আমার ফুরাইবে না' এই রোমান্টিক ইচ্ছা নয় তার শ্যামকে জানার আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে চরিত্রটির অতিবাস্তবধর্মিতার দিকটাই আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শরীর ও মনের দিক থেকে নিভে যাওয়া শ্যাম ইতু নামে এই সাধারণ নারীকে অবলম্বন করে পুনরায় জ্বলে উঠতে চেয়েছিল। তাই ইতুকে সাধারণ থেকে বিশেষ করে তোলার আকাঙ্ক্ষায় শ্যাম বলেছিল— ''আমার শরীর গরম হচ্ছে না ইতু, বহুকাল ধরে আমি ঠাণ্ডা হয়ে আছি। খেলো ইতু, খেলে আমাকে ছোঁও। তারপর তোমার জিত। ..... এতকাল তোমাকে বড় সহজেই পেয়ে যেতুম, তাই তুমি আমাকে সবচেয়ে কম লাভবান করেছ। ..... ছায়া হয়ে যাও ইতু,.....মায়াবিনী হয়ে যাও.....রহস্যময়ী হয়ে যাও.....দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাও.....আমি যেন তোমার জন্য পাগল হতে পারি..... আঃ হাঃ ইতু,"[৬] অপরদিকে শ্যামের মতো নিভন্ত পুরুষরা ইতুর মতো আধুনিকা, আত্মসচেতন নারীরও কাম্য নয়। তাই ইতু যখন ''দরজার কাছে গিয়ে একটু থামে, বলে তোমার বিছানাটা স্যাঁতস্যাঁতে শ্যাম, রোদে দিয়ো।"[৭] তখন আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে স্যাঁতস্যাঁতে শব্দের দ্বারা ইতু একসাথে শ্যাম ও শ্যাম্যের বিছানা উভয়কেই বোঝাতে চেয়েছে।

লীলা — দ্বিতীয় যে নারীকে অবলম্বন করে শ্যাম জেগে উঠতে চেয়েছিল সে হল লীলা। লীলাকে নিয়ে ভাবুক শ্যামের জীবনে রোমান্টিক যাত্রা শুরু হয়। ভিতর থেকে নিয়ে যাওয়া শ্যাম

নতুন করে বেঁচে উঠতে চায় লীলাকে ঘিরেই। তাই ''সে নিজের বুকে হাত রাখে। না, এই অচেনা রহস্যময় শ্যামকে চেনে না শ্যাম। তার শরীরের ভিতরে, মনের ভিতরে ডেকে উঠছে মেঘ, চমকে উঠছে বিদ্যুৎ, আর সমস্ত চেতনা জুড়ে থেমে আসছে অদ্ভুত এক নিঃশব্দ বৃষ্টি। বুক ভরে ওঠে। ভরে ওঠে ভালবাসায়।''[৮] লীলার সংস্পর্শে এসে ''অনেক দিন পর নিজেকে একটু জীবন্ত বলে মনে হয় শ্যামের। সে শুনতে পায় তার শরীরের মধ্যে কারখানা চলার মতো শব্দ করে চলেছে কলকবজা। সে বড় বেঁচে আছে।''[৯]

বাস্তবতার সীমায় বদ্ধ নারী লীলা শ্যামের এই রোমান্টিক ভাবনা, তার কার্যকারণহীন আচরণের কোন অর্থ খুঁজে পায় না। তাই পাগল প্রেমিক শ্যামের আচরণ লীলার মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করে। অপরদিকে শ্যামের বন্ধু অরুণ তার পারিবারিক জীবনের ক্লান্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য একটু উষ্ণতার খোঁজে লীলার প্রতি অসক্ত হয়ে পড়ে। অরুণের এই আসক্তি যে সাময়িক মোহগ্রস্ততারই ফল চতুর নারী লীলার কাছে তা অজানা থাকে না। তাই অরুণের হাত থেকে রক্ষা পেতে অস্ত্র হিসাবে শ্যামকেই সে ব্যবহার করে। ফাঁকা রেস্তরাঁয় লীলাকে অরুণ ডেকে পাঠালে সেখানে শ্যামের উপস্থিতি দেখে লীলাকে খুব শান্ত ও দৃঢ় দেখায়— ''যেন লীলার সঙ্গে আছে কোনও সমর্থ লোক, যে লীলাকে বিপদে আপদে রক্ষা করবে। লীলার চোখে মুখে সেই প্রত্যয় দেখে শ্যাম।''[১০] বুদ্ধিমতী লীলা প্রতাপশালী ব্যক্তির জামাই অরুণকে কৌশলে দূর রাখতে শ্যামের আবেগ প্রবণতাকে ব্যবহার করে পরিত্রাণ লাভ করে। শ্যাম বা অরুণ নয় লীলার জীবনে উপস্থিতি ছিল অন্য আর এক পুরুষের তাকে নিয়েই লীলা তার স্বপ্নের নীড় গড়তে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই রোমান্টিক শ্যামের অবুঝ প্রেমের ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটে উপন্যাসে। শ্যাম চরিত্রের অন্তিম পরিণতি ও ট্র্যাজিডিময় হয়ে ওঠে। উপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় একদা তাঁর 'ঘুণপোকা' উপন্যাস সম্পর্কে বলেছিলেন ''যে মানুষের জীবনে সত্যিকারের প্রেম বা অভিসার নেই, তার ও আছে মনের অভিসার, আছে কল্পপ্রেম। একটি রক্ত মাংসের মেয়ে কি কারও মানসী হতে পারে? তাকে মনে মনে গড়ে নিতে হয় বিয়াত্রিচে।''[১১] লেখক কথিত এই সত্যকে সামনে এনেছে উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি।

(খ) 'পারাপার'

ললিতের মা — 'পারাপার' উপন্যাসে যার একমাত্র পরিচয় সে 'ললিতের মা।' এই মহিলার ব্যক্তিনামের কোন উচ্চারণ উপন্যাসে আমরা পাই না। বিবাহিতা সন্তানের জননী নারীর পরিচয় কেবল তাঁর মাতৃত্বে। বাঙালি মধ্যবিত্ত নারীর বিশুদ্ধ সেই মাতৃকল্প রূপটি নির্মাণ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিকের কলমে ললিতের মায়েদের পরিচয় চিরকাল 'ললিতের মা' থেকে যায়। মাতৃত্বের

খোলসে ঢাকা পড়ে যায় তাদের আর সব পরিচয়।

স্বামী সন্তানের হাত ধরে পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল হয়ে আসা এই নারী স্বভূমি থেকে উৎপাটনের যন্ত্রণাকে ভুলতে মাটির সন্ধানী। তার এই মানসিকতা পুত্র ললিতের কাছে গোপন থাকে না। ললিতের মা বলে ''একটা বাড়ি করবি ললিত, পুরো চোদ্দ কাঠা জমির ঘেরওলা, ছ'টা আম, চারটে কাঁঠাল, একটা ডুমুর, সজনে, দশটা সুপুরি আর দশটা নারকোল গাছ লাগাবি, পিছনে থাকবে কলার ঝাড়। কুঞ্জলতা আমার বড় পছন্দ, বুঝলি! বেড়ার গায়ে গায়ে লতিয়ে দেবো। তুই তো সীম খেতে ভালোবাসিস— একটা সীমের মাচান করবি, গোয়ালঘরের চালের ওপর লকলকিয়ে উঠবে লাউডগা। ললিত জানে কোন সুদূর ছেলেবেলায় দেখা পুরনো ছবিটাকে মা আবার টেনে এনে দূর ভবিষ্যতের গায়ে টাঙিয়ে রেখেছে।''[১২] ললিতের মায়ের অতীতচারিতায় আরও পরিচয় পাওয়া যায় ললিতের উক্তির মধ্যে ''একটু কুঁজ হয়ে কেমল ছেলেমানুষের মতো বসবার ভঙ্গি মার। যেন কোন কিশোরীবেলার চিন্তায় বিভোর। আসলে এখন আর মাকে ললিতের পাকা মাথাওলা প্রবীণ মহিলা বলে মনে হয় না। সারাদিন কাঠকুড়নীর মতো কুঁজো হয়ে মা সারা ঘর ঘুরে বেড়ায়, খুঁজে খুঁজে ময়লা বের করে ঘর থেকে বার বার সামান্য জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখে, বিছানার চাদর, টান করে অকারণে, তারই ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ শূন্য হয়ে যায় চোখ, শিশুর মতো বোকা হয়ে যায় তোবড়ানো মুখ। যেন চারদিকের এই ঘর বাড়ি, ছোটখাটো জিনিসপত্র, এই ছোটো একঘরের সংসার-এর কোনো কিছুর অর্থই মা বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে ঘুমন্ত অবস্থায়ও মাকে লক্ষ করেছে ললিত। হাঁটু মুড়ে ছোটোখাটো হয়ে গিয়ে মা ঘুমোয়, নিঃসাড় সেই ঘুম, আর মাঝে মাঝে সেই মুখে একটু একটু হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়। তখন মনে হয় মা স্বপ্ন দেখছে— সেই কিশোরীবেলার স্বপ্ন।''[১৩]

কিশোরীবেলার স্বপ্নে মগ্ন ললিতের মায়ের জীবনে ভবিষ্যতের সোনালী দিনের স্বপ্নও আনাগোনা করে। তাঁর সেই স্বপ্নের একমাত্র অবলম্বন সন্তান ললিত। অবিবাহিত পুত্র ললিতকে সুখী গৃহস্থ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার আশায় আকুল মাতৃহৃদয় কখনো মিতুর মায়ের কাছে তার ললিতের জন্য মিতুকে প্রার্থনা করে কখনো বা তুলসীর কাছে বলে ''ললিতটা বাইরে বাইরে ঘোরে, আর এই লক্ষ্মীছাড়া ঘর আগলে আমার থাকা। কত কিছু আছে কলকাতায়, কালীঘাট, রামকৃষ্ণ মঠ, ভাগবত রামায়ণ পাঠ। সবাই যায়, কেবল আমারই কিছু হয় না। বসে থাকতে থাকতে দেখ আমায় বাতে ধরেছে। তোরা মেয়ে দেখ, আমি ললিতের বিয়ে দিই...।''[১৪] আবার কখনো বা ললিতের সাথে শাশ্বতীর মধুর সম্পর্ককে কল্পনায় পরিণয়ের রূপ দিয়ে এক কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করে সেই জগতেই বিচরণ করেছে এই মহিলা। তাঁর কল্পনার জগৎ এবং বাস্তব জগৎ উভয়ই আবর্তিত হয়েছে পুত্র ললিতকে ঘিরে। সন্তানের সুখী-সংসারী জীবনের কল্পনা করে ললিতের মা কাঙালপনা করে

মিতুকে বলে— ''দেখিস মিতু তোর সুখের সংসার হবে। ললিতের কুষ্ঠিতে আছে তিরিশের পর ওর ভোগসুখ, পয়সা হবে ওর দেখিস। তুই সুখে সুখে থাকবি, আমি তোদের সব দুঃখ টেনে নিয়ে চলে যাবো। দেখিস, যাওয়ার সময় আমি একটুও দুঃখ রেখে যাবে না।"[১৫] অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের উচ্চসারিতে অবস্থিত মিতুরা যে ললিতের মায়ের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করবে এই নিষ্ঠুর সত্যের কথা উপলব্ধি করে আবার ''সেইদিন মিতু চলে যাওয়ার পর মা ভয় পেয়েছিল। ললিত যদি জানতে পারে। রাতে ঘরে ফিরে এসে ললিত দেখেছিল দারুণ গরমে ও মা চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ... আমার জ্বর হয়েছে ললিত। রান্না করা আছে, তুই নিয়ে থুয়ে খা। গায়ে হাত দিয়ে ললিত বলল— কোথায় জ্বর।"[১৬] এইভাবে কল্পনা ও বাস্তব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে পুত্রের কল্যাণ কামনায় সদাজাগ্রত মাতৃহৃদয়ে।

মাতৃত্বের সবচেয়ে বড় জয় পুত্রের কাছে পরাজয় স্বীকারের মাধ্যমে। পাড়ার মহিলা মহলে নেতৃত্বস্থানীয় ললিতের মা ললিতের ভাষায় যে 'পাড়ার হিরো বুড়ি' সে মহিলা পুত্র ললিতের কাছে হার মানার জন্য অকাতরে ছলনার আশ্রয় নেয়। ললিতের মায়ের এই কপটতা ধরা পড়ে ললিতের সঙ্গে তার লুডো খেলার সময়। ''মার একটা চাল দেখে ললিত চেঁচাল—তিনের মুখে আমার গুটিটা খাও মা। ইস! মা মৃদু হাসে, ললিতের গুটি না খেয়ে অন্য গুটি চালে মা, বলে— গুটি খাবো কেন! আমি আমার পাকা গুটি ঘরে তুলবো। ... ললিতের গুটি খাওয়ার ঘরে পেয়েও এড়িয়ে যাচ্ছে মা, অন্য গুটি চলেছে। নিজের গুটি এগিয়ে দিচ্ছে ললিতের গুটির মুখে মুখে। আমার গুটি খা ললিত, তুই এগিয়ে যা।"[১৭] এইভাবে সারা উপন্যাস জুড়ে ললিতের মায়ের মাধ্যমে নারীর জননীত্বকে লেখক এক বিশেষ মহিমা দান করেছেন।

মৃদুলা— বাল্যে কৈশোরে নারী পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন নারী যেন পুরুষের সম্পত্তি — নারীর এই চিরদাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে একদা কোনো কোনো অতি প্রগতিবাদী উচ্চারণ করেছিলেন নারী-জাতীয়করণের কথা। প্রাচীনপন্থী লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তার একের পর এক উপন্যাসে সৃষ্ট নারী চরিত্রের মাধ্যম্যে দেখিয়েছেন পুরুষের অধীনতা বা সামাজিক শৃঙ্খলের মধ্যই চিরন্তন বাঙালি মধ্যবিত্ত নারী তার মুক্তির স্বাদ অনুভব করে। সহস্র বন্ধন মাঝে মুক্তিই বাঙালি মধ্যবিত্ত নারীকে আপন মহিমায় মহিমান্বিত করে। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করে নিয়েই 'পারাপার' উপন্যাসে মৃদুলা চরিত্রে যাত্রা শুরু।

বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে চিরকালই নারীরাই পরিবারের পলিকাশক্তি এবং চালিকাশক্তিও।

তবুও নারীদেরই পৌরাণিককাল থেকে বারেবারে সতীত্বের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। পারাপার উপন্যাসে মৃদুলাও সতীত্বের প্রশ্নে নিজেকে কলঙ্কমুক্ত রাখতে স্বামী তুলসীর কাছে বিভুর প্রসঙ্গ গোপন রাখেনি। বিভুর প্রতি বিন্দুমাত্র হৃদয় দুর্বলতা না থাকলেও তুলসীকে ''তোমার ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয়'' বলে অভয়বাণী দিয়ে মৃদুলা তাকে বিভুর বৃত্তান্ত শুনিয়েছে। ''পাড়ারই ছেলে সব। তাদের মধ্যে একজন ছিল বিভু। লেখাপড়া শেখেনি, বাপ দুধ বিক্রি করত, পয়সা ছিল অনেক। ... কলেজে যাতায়াতের পথে প্রায়ই দেখা হত, কোনো দিন বা বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকত, সকালসন্ধে অসংখ্যবার আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যেত। ... আমাকে দেখলেই চাপা গলায় ওর বন্ধুরা বলত— বিভু, তোরটা, তোরটা। ... বাবাকেও বলতে ইচ্ছে করত না, কেননা বাবা তোমার মতোই ভীতু ভালমানুষ, এসব শুনে হয়তো খুব নার্ভাস হয়ে পড়বেন, আর বলা যায় না, ভীতুদের যা স্বভাব, হয়তো বলে বসবেন— ওর সঙ্গেই তোর বিয়ে দিয়ে দিই মৃদুলা। কলেজে যাওয়া বন্ধ হল, বিয়ের জন্য তাড়াহুড়ো শুরু করলেন। একমাসের মধ্যেই বাবা তোমার খবর আনলেন, বললেন চমৎকার ছেলে, খুব সৎ আর নিষ্ঠাবান। ব্যস বিয়ে হয়ে গেল।''[১৮] আর নববিবাহিত পুরুষ তুলসী যার সম্পর্কে বন্ধু সঞ্জয় বলেছে ''কী একটা বউ যে হয়েছে ওর (তুলসীর) ত্রি-ভুবনসুন্দরী, বুকের মধ্যে সেই বউয়ের দোলমঞ্চ নিয়ে ব্যাটা ঘুড়ে বেড়ায়। ... কেবল বউয়ের কথা শালা এমন বেহায়া, বলে কিনা বিয়ে করে অনাস্বাদিতপূর্ব সুখে ডুবে আছি, বউ বড় সুখী করেছে আমাকে ঠিক ঐরকম বইয়ের ভাষাতেই বলেছিল।''[১৯] সেই তুলসীই বিভুর বৃত্তান্ত শোনার পর ঠিক স্বস্তি পেল না। যদিও নির্দোষ মৃদুলার প্রতি বিরাগজনিত কোন কারণে নয়, কিন্তু অস্বস্তিটা ছাড়ল না তাকে। ''হ্যাঁ তুলসী বোঝে। তবু মন থেকে প্রশ্নটা গেল না। কেন কিছু লোক মৃদুলার পিছনে ঘুরঘুর করত? কেন? অ্যাঁ! কি তাদের অধিকার একটা মেয়ের পিছনে ঘুরঘুর করার। ভয়ঙ্কর অন্যায় এটা, ভীষণ অন্যায়।''[২০] পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদের অন্যায় ও নারীদের অন্যায়ের পৃথক সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়।

সমাজব্যবস্থার এই অন্যায় অসঙ্গতির প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকে পুরুষ লেখক গোষ্ঠীরও। তাই শীর্ষেন্দুর কলমে তুলসীর মতো পুরুষদের বিভুর মতো সমাজবিরোধীর প্রতি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের উৎস যে স্ত্রীর প্রতি সন্দেহপ্রবণ মানসিকতারই পরিচয় তা সহজেই বোঝা যায়। একবিংশ শতাব্দীতেও বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে পুরুষদের পত্নীপ্রেম শর্তসাপেক্ষ। অর্থাৎ স্বামী-প্রেমে একমুখীন নারীরাই কেবল স্বামীর প্রেয়সী হবার যোগ্য। উপন্যাসে তুলসী-মৃদুলার সম্পর্ক সেই সত্যকে প্রমাণ করে। অন্যদিকে পুরুষদের বহুগামিতা সমাজের ন্যায় সাহিত্যেও অনেকটা সহানুভূতির সঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়। লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কলমেও অনেক সময় বহুগামী

পুরুষের প্রতি সহানুভূতি বর্ষিত হতে দেখা যায়। কিন্তু নারীর বহুগামিতা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে 'নৈব নৈব চঃ'। তাই তাঁর সৃষ্ট পুরুষ তুলসী ভাবে ''মৃদুলার আকর্ষণশক্তি না থাকলেই ভাল ছিল। মনে হয়েছে যে, মেয়েদের বেশি আকর্ষণশক্তি থাকা বা উগ্র সুন্দরী হওয়াটা এক ধরনের অন্যায়। ... এত অল্পে সে মৃদুলাকে ছেড়ে দেবে বা ভুলে যাবে এটা সম্ভব নয়।''[২১]

পাশ্চাত্যের প্রভাবে এদেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতাবোধের জন্ম হয় এবং বিংশ শতাব্দীতে তা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতাবোধের উগ্রতায় বাঙালি মধ্যবিত্তের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হতে থাকে এবং স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে ছোট ছোট নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির আর্বিভাব ঘটে। নিজের মতো করে থাকা এ যুগে যৌথ পরিবারভুক্ত সদস্যদের একমাত্র মনের ইচ্ছা। এই ইচ্ছা নিয়েই মৃদুলা তুলসীর দাদা বৌদির সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখে। মৃদুলার এই ইচ্ছা ধীরে ধীরে তুলসীর মধ্যেও সংক্রমিত হয়। তবে দাদা বৌদির পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার আকাঙ্ক্ষা মৃদুলা থেকে তুলসীতে সংক্রমিত হয়েছে না তুলসী থেকে মৃদুলাতে সংক্রমিত হয়েছে উপন্যাসে তা বলা সহজ নয়। এক কথায় বলা যেতে পারে উভয়ই যুগধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। তাই তুলসী বলে ''দাদার সংসারে অনেককাল থাকা হয়ে গেল তার। চুয়াল্লিশ সালে বাবা মারা গেল, তার সাড়ে তিন বছর পর মা, তারপর থেকে দিন শেষে বাসায় ফেরার সময়ে কোনো দিন তার মনে হয়নি— বাসায় ফিরছি। এখন মাঝে মাঝে তার নিজের বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করে। নিজের বাসা— যেখানে সকালবেলা সুন্দর কথাগুলো সে অনর্গল শোনাবে মৃদুলাকে।''[২২] অর্থাৎ দাদার সংসার আর তার নিজের সংসার যে সম্পূর্ণ আলাদা এ ভাবনা শুরু থেকেই তুলসীর মধ্যে স্পষ্ট। তাই ললিতের মৃত্যুর পর ললিতের পরিবর্তে শম্ভুর ঘরের নতুন ভাড়াটে হিসাবে সে নিজেকে কল্পনাও করে নেয়। অথচ মধ্যবিত্ত পরিবারে ভাঙনের জন্য সমাজ কেবলমাত্র মৃদুলার মতো নারীদেরই অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। পুরুষরা থেকে যায় নিষ্কলঙ্ক।

শাশ্বতী — ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ ও তার পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িকতার কীটদংশনে ক্লীষ্ট ছিন্নমূল মানুষের ঢল নামে পশ্চিমবঙ্গের বুকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইসব উদ্বাস্তু মানুষদের জন্য ত্রাণ শিবির তৈরি করে। পরে ধীরে ধীরে পতিত জমিতে বাঙাল কলোনি সৃষ্টি করে তাদের বসতি স্থাপনের বন্দোবস্ত করে। কিন্তু এইসব উদ্বাস্তু কলোনিগুলি অসামাজিক কার্যকলাপের পীঠস্থান হয়ে ওঠে। ফলে এইসব কলোনিগুলিতে বসবাসকারী মানুষদের জীবনে এক অভিশপ্ত অধ্যায়ের সূচনা হয়। এমনি এক অভিশপ্ত জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে শাশ্বতী উপন্যাসে জায়গা করে নিয়েছে।

দেশভাগের পর ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় আশ্রয়ের সন্ধানী মানুষের জীবনে বিপর্যয় এসেছিল নানা দিক থেকে। অন্নহীন, বস্ত্রহীন দিশাহারা মানুষরা নারীর মর্যাদা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাই ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছিল নারীর মর্যাদা। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর দ্বারা বারবার ঘটেছে নারীধর্ষণের ঘটনা। এরকম এক তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় শাশ্বতীর পরিবার। ধর্ষিতা হয় শাশ্বতীর দিদি লীলাবতী। ''একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে লীলাবতীকে কয়েকজন শয়তান লোক গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। সারা রাত তারা লীলাবতীকে ব্যবহার করে খুব ভোরে ক্যালকাটা ফুটবল মাঠের বেড়ার কাছে ফেলে রেখে যায়, পৌষের শীত আর মাসের শিশিরের মধ্যে। মাস দেড়েক নিউমোনিয়া আর এক ধরনের আচ্ছন্নতার অসুখে ভুগে উঠবার পর সে যখন মাস দেড়েকের গর্ভবতী তখন সমীর সান্যাল নামে একজন উদার পুরুষ তাকে সব জেনে বিয়ে করে নিয়ে যায়। তাদের পরিবারে সেই প্রথম রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হল। তারপর গত আট-দশ বছর আর লীলাবতীর কোনো খবর রাখে না তারা।''[২৩] এইভাবে শাশ্বতীদের পরিবার থেকে লীলাবতীর নাম মুছে যায় চিরকালের মতো। নাম মুছে যায়, কিন্তু লীলাবতীর স্মৃতি নিষ্ঠুরভাবে তাড়া করে পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে। ''দুঃসহ সেই স্মৃতির তাড়না সহ্য করতে না পেরে শাশ্বতীর বাবা একদিন খুব গম্ভীরভাবে তাদের উঠোনে একটা গর্ত খুঁড়তে লাগল। প্রকাণ্ড গর্ত। তার ওপর লতাপাতা বাঁখারি দিয়ে একটা ছাউনি দিল। তারপর একদিন তার মধ্যে ঢুকে জামাকাপড় ছেড়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বসে রইল।''[২৪] অর্থাৎ মানসিক ভারসাম্যহীন শাশ্বতীর বাবার জীবনে শুরু হয় এক ট্র্যাজিক অধ্যায়। আর কিশোরী শাশ্বতীর এক্কাদোক্কা কিংবা গুটি খেলার দিনগুলিতে নেমে আসে গভীর বিষণ্ণতা।

কৈশোরের বিষাদঘন অভিজ্ঞতা নিয়ে যে নারীর জীবনের পথ চলা শুরু সে পুরুষদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সমাজে চলাফেরা করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু লীলাবতীর ঘটনার পর কঠিন পারিবারিক অনুশাসনে বিশ্বাসী শাশ্বতীর দাদা কালীনাথ বোন হৈমন্তী ও শাশ্বতীকে পাত্রস্থ করার দায়ে পারিবারিক অনুশাসনকে ঢিলে করে দেয়, এবং সচেতনভাবে বোন শাশ্বতীকে ঠেলে দেয় সহকর্মী আদিত্যর দিকে। জীবনে খুব বেশি পুরুষ না দেখা শাশ্বতী সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে আদিত্যর প্রতি। একদিকে লীলাবতীর কলঙ্কজনক ঘটনার দুঃখজনক স্মৃতি, অন্যদিকে অপ্রকৃতিস্থ বাবা এবং অবিবাহিতা বিবাহযোগ্য দিদি হৈমন্তীকে ঘিরে দাদা কালীনাথের চিন্তাগ্রস্ততা, সব মিলিয়ে পারিবারিক জটিল আবর্তে ঘূর্ণায়মান শাশ্বতীর কাছে আদিত্য ছিল মুক্তির দূত, দক্ষিণা বাতাস।

আদিত্যর প্রতি শাশ্বতীর আকর্ষণ সখ্যতাজনিত না প্রেমজনিত এই অতিবাস্তবোচিত প্রশ্ন শাশ্বতীর মনে প্রথম উদয় হয় আদিত্যর বন্ধু ললিতের সঙ্গে পরিচয়ের পর। ললিতের সাথে আলাপের প্রথম দিনই শাশ্বতীর হৃদয় অন্যকথা বলে ওঠে। চোখের বালি (১৯০১) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ

প্রথম বিনোদিনীর জটিল মনস্তত্ত্বের পরিচয় দেবার জন্য চরিত্রের আঁতের কথা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। তারই উত্তরসূরি লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় শাশ্বতী চরিত্রের আঁতের কথা প্রকাশের জন্য অদ্ভুত চিত্রকল্পের সাহায্য নিয়েছেন। ললিতের সাথে পরিচয় হবার পর শাশ্বতী স্বপ্নে বারবার লণ্ঠন হাতে ছায়ামূর্তির আবির্ভাব যে আসলে তার জীবনে দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত ললিতের আবির্ভাবকেই ইঙ্গিত করেছে সহৃদয় পাঠক সমাজে তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। শাশ্বতীর স্বপ্নের সেই অস্পষ্ট ইঙ্গিতকে স্পষ্টতা দিয়েছে আদিত্যর সাথে শাশ্বতীর বিবাহ দেবার জন্য ললিতের অস্বাভাবিক রকমের উদ্যোগী হয়ে ওঠা এবং শাশ্বতীর আদিত্যকে এড়ানোর জন্য শিবানীর দাদার প্রতি অহেতুক উৎসাহ দেখানোর ঘটনার মধ্য দিয়ে।

শাশ্বতীর জীবনে নবাগত এই প্রেম সম্পর্কে আদিত্য অবহিত ছিল। তাই সে শাশ্বতীকে বলে ''তোমাকে ওর (ললিত) খুব পছন্দ হয়েছে।''[২৫] শাশ্বতী ললিতের সম্পর্ক নিয়ে আদিত্যর মনোভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে শাশ্বতীর সঙ্গে তার দীর্ঘ সংলাপে। আদিত্য বলে ''তুমি (শাশ্বতী) আর ললিত চায়ের দোকানে আমার দু-পাশে বসেছিলে। খুব অল্পই কথা হয়েছে তোমাদের। আর তক্ষুণী আমার মনে হচ্ছিল, তোমরা-তুমি-আর ললিত পরস্পর নিঃশব্দে কথা বলছো। সে কথা চোখ-মুখের কোনো ইঙ্গিতে নয়। সেটা হচ্ছিল আরো রহস্যময় সাংকেতিক কোনো সূত্রে— যা আমি বুঝতেই পারলুম না। সেটা বোঝার সাধ্যই আমার নেই— আমার জাত একদম আলাদা। অথচ তোমাদের মধ্যে তেমন কোনো কথাবার্তাই হয়নি, এমনকি তোমরা কেউ কাউকে খুব ভাল করে দেখওনি। একবার তুমি কেবল ব্যাকুল হয়ে বলেছিলে দেখবেন, আপনি ভাল হয়ে যাবেন, আর একবার ললিত তোমার বাড়ি যশোরে শুনে আগ্রহ দেখিয়েছিল, ব্যস এইটুকুই। তবু আমার মনে হচ্ছিল আমাকে মাঝখানে রেখে অনেক কথা নিঃশব্দে চলাচলি হয়ে গেল তোমাদের।''[২৬] শাশ্বতীর জীবনে এইভাবে নিঃশব্দ চরণে আসা প্রেমের কোন চরম পরিণতি লেখক দেখাননি ঠিকই কিন্তু আদিত্য-শাশ্বতী-ললিত এই ত্রিকোণ সম্পর্কের জটিল ওঠা পড়ার মধ্য দিয়ে শাশ্বতী চরিত্রটি মানসিক ক্রমবিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত হয়েছে।

(গ) 'দূরবীন'

জীবন বিষয়ক একটি বক্তব্যকে উপন্যাসের মাধ্যমে পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ায় যে কোন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস রচনার মূল কারণ। অর্থাৎ উপন্যাসের মাধ্যমে লেখকের চিন্তা চেতনার সঙ্গে পাঠকের চিন্তা চেতনার মেলবন্ধন ঘটে। এই মেলবন্ধনের কাজটি মূলত সম্পন্ন হয়

উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যদিয়ে। চরিত্রগুলিই লেখকের ভাবনার বাহক হয়ে ওঠে। ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, পুরোনো রীতিনীতি সংস্কৃতির ওপর আস্থাশীল বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি স্থানিয় উপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের প্রতিরোধহীন ভাঙনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তার দূরবীন উপন্যাসে আত্মমগ্ন হয়ে তিনি পিছিয়ে গেছেন স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অভিভক্ত বাংলার সামন্ততান্ত্রিক গ্রামজীবনে এবং সেখান থেকে ডুবরীর সমুদ্র থেকে মুক্ত তোলার মতো করে রঙ্গময়ী চরিত্রটিকে তুলে এনে আমাদের সামনে হাজির করেছেন। উপন্যাসের শুরুতে মৃত্যুভাবনা নিয়ে রোমান্টিক বিলাসিতায়রত জমিদার হেমকান্ত চৌধুরী যখন বলেন ''হেলে পড়া গাছ যেমন ঠেকনায় ভর দিয়ে বেঁচে থাকে, তেমনি স্ত্রীবিয়োগের সময় তাঁকে ঠেকা দিয়ে রেখেছিল রঙ্গময়ী। শুধু রঙ্গময়ী বলেই পেরেছিল। নইলে তখনই হেমকান্তর সংসার ছাড়ার কথা।''[২৭] এখান থেকেই পাঠককূল মোটামুটি আভাস পেয়ে যায় যে উপন্যাস শীর্ষেন্দু রঙ্গময়ী চরিত্রটিকে তার কল্পিত সর্বংসহা দূরচেতা নারী হিসাবে অঙ্কন করার জন্য পটভূমির সূচনা করলেন। হতদরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে রঙ্গময়ী। তার বাবা বিনোদচন্দ্র হেমকান্ত চৌধুরীর বাড়ির কূলপুরহিত। সেই হিসাবে উচ্চাঙ্ক্ষাহীন, অতিসাধারণ, লোভলালসাহীন জীবনযাপনের অভ্যাস তার সহজাত।

কিন্তু একদিকে নিজেদের দীনহীন দিনযাপন অন্যদিকে হেমকান্তদের জমিদারি ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য যার মস্তিষ্ক বিকৃতির সূচনা করেছিল সে হল রঙ্গময়ীর বিধবাপিসি। নৈতিক চরিত্রহীন, লালসার স্বীকার কিছুটা বিকৃতকামনার বলী এই নারী রঙ্গময়ীকে ঢেলে দেয় হেমকান্তর ভাই নলিনীকান্তর দিকে। এর জন্য রঙ্গময়ীর পিসি কনক যে পথ অবলম্বন করে তা ঘৃন্ন ও নিন্দনীয়। ''একদিন একটু বেশি রাত্রে সকলে ঘুমানোর পর রঙ্গময়ীকে ঠেলে তুলে দিল কনক, যা তো নলিনীর বোধহয় খুব জ্বর এসেছে। দেখে আয় তো। রঙ্গময়ী ঘুমচোখে একটু অবাক হলেও তড়িঘড়ি গিয়ে ঢুকেছিল নলিনীর ঘরে। নলিনী পড়তে পড়তে মুখ তুলে অবাক হয়ে চাইল। এত রাত্রে রঙ্গময়ী। কিছু বুঝবার আগেই বাইরে থেকে দরজা টেনে শিকল তুলে দিল কনক।''[২৮] কিন্তু কনকপ্রভা তখনও এক গূঢ় সত্যের কথা জানতে পারেননি সেই সত্যটা হল বালিকা রঙ্গময়ীর মনে তখন ধীরে ধীরে স্থান করে নিচ্ছে অপর এক পুরুষ সে পুরুষ হল নলিনীকান্তের দাদা জমিদার হেমকান্ত চৌধুরী। বুদ্ধিমান নলিনীকান্ত'র কাছে কিন্তু এ সত্য ছিল জলের মতো সরল। তাই সেই রাত্রে যোগীপুরুষ নলিনীকান্ত রঙ্গময়ীকে বলেছিল ''তুমি কি কারও প্রতি আসক্ত রঙ্গময়ী... আমি বলছি কোনও মেয়ে যদি কোনও পুরুষের প্রতি আসক্ত হয় এবং বর্ণে, ধর্মে, শিক্ষায় দীক্ষায় যদি মিল থাকে তবে তাকেই তার বিয়ে করা উচিত। যদি বিবাহ সম্ভব নাও হয় তবে অন্য কোনও পুরুষকেও তার গ্রহণ করা উচিত নয়।''[২৯]

নলিনীকান্তর এই উপদেশ রঙ্গময়ীর জীবনবেদে পরিণত হয়েছিল। ঘটনাচক্রে হেমকান্তর বিয়ে হয় সুনয়নীর সাথে এবং বিবাহের পর ঘোরতর সংসারী হেমকান্তর প্রতি বালিকা রঙ্গময়ীর ভালবাসার চোরাস্রোত বহমান থাকে। দৃঢ়চেতা, ভয় লজ্জাহীন রঙ্গময়ী তার নানা চটুল আচরণের মাধ্যমে হেমকান্তর প্রতি তার সেই প্রেমের প্রকাশ ঘটাতে থাকে। রঙ্গময়ীর একমুখীন প্রেমের প্রাবল্যের ধাক্কায় বিপর্যস্ত হয়েছে হেমকান্ত ধীরে ধীরে হেমকান্তর হৃদয় অভ্যন্তরে ভাঙন শুরু হয়েছে। তাকে পাবার ব্যাকুলতায় মগ্ন যোগিনীপাড়া রঙ্গময়ীর কাছে পরাজয় মেনে ধরা দিয়েছে হেমকান্ত চৌধুরী। হেমকান্ত ও রঙ্গময়ীর মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে ভালোবাসার এক চোরাস্রোত। যা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে হেমকান্তর স্ত্রী সুনয়নীর কাছেও। তাই বাপের বাড়ি যাবার সময় সুনয়নী রঙ্গময়ীকে বলেছে— ''বেরোবার সময় কর্তাকে বললাম ওগো যাচ্ছি, ভালমতো থেকো। উনি কী বললেন জানো? বললেন ও নিয়ে ভেবো না। রঙ্গময়ী তো আছে। ... এই কথাটুকু বড় কম নয়। অন্য বউ হলে ব্যাঙের গর্ত থেকেই চ্যাং মাছ বের করত। যাই দুজনে রইলে কিন্তু।''[৩০] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম সফল সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদা তার কমলাকান্তের দপ্তর প্রবন্ধে বলেছিলেন সাহিত্য রচনা করে যদি সমাজের কল্যাণ সাধন করা না যায় তাহলে সাহিত্যিকের লেখনী ধারণ নিষ্প্রয়োজন। বঙ্কিমের এই নীতিবগীশতায় কমবেশি প্রভাবিত আজকের সাহিত্যিক সমাজও। ঔপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও এর ব্যতিক্রম নন। তাই হেমকান্ত রঙ্গময়ীর অবৈধ প্রেমের ব্যাপারটি বেশিদূর অগ্রসর হবার আগে উপন্যাসে তিনি হেমকান্তর স্ত্রী সুনয়নীর মৃত্যুর ঘটনাটি সংগঠিত করেছেন। যার ফলে কিছুটা হলেও কলঙ্কমুক্ত হয়েছে হেমকান্ত রঙ্গময়ীর প্রেম সম্পর্ক। এরপর ধীরে ধীরে রঙ্গময়ী হেমকান্তর কর্ত্রীহীন পরিবারের রাশ টেনে ধরেছে। হয়ে উঠেছে সংসারের সর্বময় কর্ত্রী।

অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, বাস্তববুদ্ধি সম্পন্না এই নারী একের পর এক সময়োচিত ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হেমকান্তর কন্যা বিশাখার বিবাহের সিদ্ধান্ত তার মধ্যে অন্যতম। প্রচণ্ড দূরদর্শী মহিলা রঙ্গময়ী তার প্রত্যুৎপন্নতার দ্বারা অনুভব করেছিলেন বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্রের প্রভাব প্রতিপত্তির দিন প্রায় শেষ। তাই সে বিশাখার বিবাহ স্থির করেছিল কোন অস্তমীত সামন্ত পরিবারে নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকে উদীয়মান পেশানির্ভর পরিবারের স্বনির্ভর, পরিশ্রমী, শিক্ষিত যুবক শচীনের সঙ্গে। তারই পরামর্শে শচীন হেমকান্তর এস্টেটের উকিল নিয়োজিত হয়েছে। এবং বিচক্ষণশীল ''শচীন বুঝতে পেরেছে, জমিদারির অবস্থা খুব খারাপ নয়। কিন্তু ঠিকমতো তদারকি হয়নি বলে আদায়পত্র ভীষণ কম হচ্ছে কয়েক বছর। একটু চেষ্টা করলে এবং সতর্ক থাকলে সংকট কাটিয়ে ওঠা যাবে। কিন্তু কাজটা করবে কে? শচীন জানে, হেমকান্ত আপনভোলা লোক।

বিষয়-আশয়ে মন নেই। তাঁর ছেলেরা জমিদারিতে আগ্রহী নয়। জমিদারি হল ভাগের মা।"[৩১] হেমকান্তর সেই ভাগের মা জমিদারিকে পুনর্জীবিত করতে আত্মনিয়োগ করে শচীন। সামন্ততান্ত্রিকতার অন্ধমোহে আচ্ছন্ন বিশাখার দ্বারা প্রত্যাখিত হয়ে ব্যথিত অপমানিত শচীন হেমকান্তর পুত্রবধূ চপলার সঙ্গে এক অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। শচীন-চপলার সম্পর্কের টানাপোড়েনকে ঘিরে উপন্যাসে সৃষ্টি হয় গভীর জটিলতা। সম্পর্কের এই গভীর সংকটের দিনেও রঙ্গময়ী সর্বদা হেমকান্ত ও তার পরিবারের পাশে থেকে সংকট থেকে মুক্তির রাস্তা খুঁজেছে। হেমকান্তর কন্যা বিশাখাকে সৎপরামর্শ দিয়ে সঠিক পথের দিশা দিয়েছে। বিশাখার শত অপমানও রঙ্গময়ীকে তার অবস্থান থেকে টলাতে পারেনি।

রঙ্গময়ীর চারিত্রিক দৃঢ়তার আর এক প্রকাশ আমরা দেখি ভারতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলনের ঘটনায় তার পরোক্ষ কখনো কখনো বা প্রত্যক্ষ অবদানের মধ্য দিয়ে। তার উৎসাহেই বিপ্লবী শশীভূষণ হেমকান্তর বাড়িতে আশ্রয় লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও সেবা লাভ করেছে। আবার মৃত্যুপথযাত্রী শশীভূষণকে চিকিৎসা ব্যাপার সে যখন হেমকান্তকে জানায় রোগেভুগে মৃত্যুর চেয়ে শশীভূষণের পক্ষে ফাঁসি দড়িতে মৃত্যুবরণ অনেক শ্রেয়। কারণ তাহলে ওর কথা তো কেউ জানতে পারবে না পত্রিকায় ওর নাম উঠবে না। ইতিহাসে নামটা লেখাও থাকবে না। দেশের জন্য ফাঁসিতে চড়লে ইতিহাসে তার নাম লেখা থাকবে, রোগেভুগে মৃত্যুবরণ করল ভবিষ্যতের ইতিহাসে তার কোন জায়গা হবে না তখন আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে এ নারী সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের সহজ সাধারণ নারী নয়, রঙ্গময়ীর চিন্তাভাবনার গভীরতা ও দূরদর্শীতা আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। হেমকান্তের মতো অদূরদর্শী, রোমান্টিক, ভাবনাবিলাসী, বাস্তববোধহীন চরিত্রের বিপরীতে রঙ্গময়ীর মতো চরিত্রের উপস্থিতি সম্পর্কের একটা বৃত্তকেই যেন সম্পূর্ণতা দিয়েছে।

'দূরবীন' উপন্যাসে একটি অন্যতম প্রধান চরিত্র হল হেমকান্তর কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণকান্ত। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং প্রবল ব্যক্তিত্বশীল এই চরিত্রের হয়ে ওঠার পিছনে রঙ্গময়ীর অবদান সুস্পষ্ট। কাকা নলিনীকান্তের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কৃষ্ণকান্তের অন্তরে যে স্বদেশীয়ানার তথা দেশপ্রেমের বীজ সুপ্ত ছিল রঙ্গময়ীর সক্রিয় প্রচেষ্টাতই সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বীক্ষে পরিণত হবার সম্ভাবনার দিকে অগ্রসর হয়েছে। রঙ্গময়ীর পরামর্শেই কৃষ্ণকান্ত একা থাকতে ব্রহ্মচর্য করতে এবং একবেলা খেয়ে থাকার অভ্যাস শুরু করেছে। আবার রঙ্গময়ীর উৎসাহতেই ইরফান নামের একজন ডাক সাইটের লাঠিয়ালের কাছে কৃষ্ণকান্তের লাঠি চালানোর তালিম শুরু হয়েছে। কৃষ্ণের স্বদেশি প্রীতির কথা জানতে পেরে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন পিতা হেমকান্ত গভীরভাবে চিন্তিত

তখন রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সব কিছু কি তোমার আর আমার ইচ্ছেয় চলবে গো! এ যা যুগ পড়েছে এর হাওয়া বাতাস গায়ে, লাগবেই। কৃষ্ণ তোমার অন্য ছেলেদের মতো আঁচল ধরা নয়। হয় মায়ের আঁচল, নয় তো বউয়ের আঁচল ধরে যারা টিকে আছে, তাদের থেকে ওর ধাত আলাদা। স্বদেশির হাওয়া থেকে ওকে বাঁচাতে হলে তোমাকে ছেলে নিয়ে কাশীবাসী হতে হয়।"[৩২] এরপর দেশকালের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন রঙ্গময়ী কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে তার পুত্রসম কৃষ্ণকান্তকে উৎসর্গ করেছে দেশমাতার কাছে। কৃষ্ণকান্ত হয়ে উঠেছে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সক্রিয়কর্মী। বাঙালি মধ্যবিত্ত নারীর মাতৃত্বের এই বিরল দৃষ্টান্ত কেবল স্বাধীনতাপূর্ব ভারতবর্ষেই সম্ভব ছিল। এ উপন্যাসে রঙ্গময়ী যেন প্রমাণ করে দিল বাঙালি মায়েরা যেমন তাদের অসীম স্নেহের ছায়ায় সন্তানদের স্নেহশীল, কমনীয়, সহনশীল করে তোলে তেমনি আবার দেশের দশের প্রয়োজনে উচিত শিক্ষা ও সঠিক পথের দিশা দিয়ে কৃষ্ণকান্তর মতো দৃঢ়চেতা, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ন্যায়নিষ্ঠ, সতদ্রষ্টা দেশসেবক ও উপহার দিতে পারে। আবার আমরা একথাও বলতে পারি কৃষ্ণকান্ত চরিত্র নির্মাণে রঙ্গময়ীর ভূমিকা আসলে আমাদের বর্তমান সমাজের বিলুদের (মানব জমিন) চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সন্তানের চরিত্র গঠনে মায়ের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত।

ধীরে ধীরে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে যেভাবে লেখক রঙ্গময়ী চরিত্রকে পাঠকের সামনে আদর্শায়িত করে তুলতে চেয়েছেন তাতে আমাদের কাছে চরিত্রটি তার স্বাভাবিকতা নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু লেখকের কেবল একটিমাত্র পদক্ষেপ রক্ষণশীল পাঠককূলের মনকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সেই প্রশ্নটি হল পরিণত বয়স্ক, পরিপূর্ণ সংসারী হেমকান্ত ও রঙ্গময়ীর তথাকথিত প্রণয় কি অবৈধ প্রেমেরই নামান্তর নয়? তৎকালীন সমাজের দৃষ্টিতে কি গ্রহণযোগ্য ছিল তাদের সেই প্রণয় আখ্যান। বিচক্ষণশীল ও নীতিবাগিশ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় হয়তো অবগত ছিলেন বিষয়টি নিয়ে। কিন্তু উপন্যাস সাহিত্য হল এমন একটি শিল্প মাধ্যম যেখানে চরিত্র সৃষ্টি হয় ঔপন্যাসিকের দ্বারা অর্থাৎ চরিত্রের জন্মদাতা ঔপন্যাসিক কিন্তু সর্বদা চরিত্রের আচরণের সর্বাঙ্গিক নিয়ন্ত্রক ঔপন্যাসিক হতে পারেন না। যেখানে সেটা হয় সেখানে উপন্যাসের বাস্তবতা রক্ষা হলেও শিল্পরূপ ক্ষুণ্ণ হয় বলে মনে হয়। সামাজিকতায় দায়বদ্ধ ঔপন্যাসিক তাই শিল্পের সত্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে সামাজিক সত্য রক্ষার তাগিদে চরিত্রের বকলমে পাঠক সমাজের কাছে নিজেই জবাবদিহি করতে থাকেন। 'দূরবীন' উপন্যাসে যখন ''হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, আমাকে যা তা একটা কিছু বোঝালেই যে আমি বুঝব অত বোকা আমি নই, মনু (রঙ্গময়ী)। আমি বিপত্নীক, তুমি এখনও কুমারী। যদি চাই তো আমরা বিয়ে করতে পারি। তাতে কোনও নৈতিক অপরাধ হয় না, বিশ্বাস ঘাতকতাও হয় না, পাপও হয় না। বরং অরক্ষণীয়া কন্যাকে উদ্ধার করার পুণ্যই হয়।"[৩৩] তখন

হেমকান্তর স্বীকারোক্তি যেন হয়ে ওঠে ঔপন্যাসিকেরই জবাবদিহি। কিন্তু জবাবদিহি করেই ঔপন্যাসিক আত্মতুষ্ট থাকেননি। তিনি উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত হেমকান্ত রঙ্গময়ীর বিবাহও দিয়েছেন বিবাহ পরবর্তীকালে হেমকান্তর স্ত্রী হিসাবে রঙ্গময়ীর অপর আর এক রূপের আমরা পরিচয় পাই। সেখানে আমরা দেখি নিজের অধিকারবোধ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, দৃঢ়চেতা, নিজ সিদ্ধান্তে অনঢ়, গৃহিণী হিসাবে নিজের কর্তব্য পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এক নারীকে। হেমকান্তর প্রথমা স্ত্রী সুনয়নীর সোনার অলঙ্কার যা বিশাখার প্রাপ্য, যা বিশাখার বিবাহের জন্য অত্যন্ত জরুরি সেই অলংকারকে রঙ্গময়ী জোঁকের ধনের মতো রক্ষা করেছে। মা সুনয়নীর অলংকারের উপর তীব্র লালসা ছিল হেমকান্তর কন্যা ও পুত্রবধূদের কিন্তু সেগুলি রঙ্গময়ীর হেফাজতে থাকায় হেমকান্তর কন্যা ও পুত্রবধূরা রঙ্গময়ীর উপর তীব্র বিষ বর্ষণ করেছে। বিশাখার বিবাহ উপলক্ষে আগত আত্মীয়স্বজনদের কু-কথা, কু-নিন্দায় সরগরম হয়ে উঠেছে অনুষ্ঠান বাড়ি, এমনকী তারা সকলে একত্রিত হয়ে হেমকান্ত রঙ্গময়ীকে সবরকম অসহযোগিতার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। এমনকি হেমকান্তর কন্যা সবিতা পিতাকে সরাসরি জানিয়েছে ''আপনি একজন নষ্টচরিত্রের মেয়ে-মানুষকে ঘরে ঠাঁই দেবেন জানলে আমরা বিশাখার বিয়েতে আসতাম না। আপনার জামাইরাও অত্যন্ত লজ্জায় পড়েছেন। ... আপনার মনুই যখন সবদিক সামলাচ্ছে তখন আমাদের আর কীসের দরকার। ... তবে আমি আজই শ্বশুরবাড়ি রওনা হয়ে যাচ্ছি।''[৩৪] আর হেমকান্তর নবপরিণীতা স্ত্রী রঙ্গময়ী নিজের কর্তব্য সম্পর্কে হেমকান্তকে ''মাথা নাড়িয়া কহিল সাহস নয়গো কর্তব্য। জানি এ গয়না হাতছাড়া করলে তোমাকে অনেক দেনা করতে হবে। বিয়ের জন্য এমনিতেই একটা মহাল চলে গেল। খরচ তো কম নয়।''[৩৫] যে নারী তার সহস্র হাত প্রসারিত করে দিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পুরুষের পাশে দাঁড়ায়, তাঁর মনে শক্তি জোগায়, স্বস্তি দেয় সেই নারীই তো ধাত্রীস্বরূপা। বিশাখার বিবাহ উপলক্ষে হেমকান্তর জীবনে উপস্থিতি সংকটের দিনে হেমকান্ত যেন আবার নতুন করে আবিষ্কার করেছে রঙ্গময়ীকে মধ্যবিত্ত পরিবারের এই নারীকে নবরূপে, ভিন্নভূমিকায় এই আবিষ্কার কেবল হেমকান্তর একার নয় এ যেন লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়েরও এক আবিষ্কার।

উপন্যাসে দেখি অত্যন্ত নিম্নমধ্য পরিবারের মেয়ে রঙ্গময়ী। তার বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে প্রচণ্ড দারিদ্র্যতার মধ্য দিয়ে। তবু তার চরিত্রে কোন দিন সততার কোন অভাব ঘটেনি। জমিদার পরিবারের সান্নিধ্যে থেকেও লোভ লালসা কোনদিন কলঙ্কের ছায়াপাত ঘটাতে পারেনি তার মধ্যে। রঙ্গময়ীর প্রতি আসক্ত হেমকান্ত যখন রঙ্গময়ীর সান্নিধ্য লাভের আশায় তাকে স্ত্রী সুনয়নীর সেবার কাজে নিয়োজিত করে তখন রঙ্গময়ী স্পষ্ট জানিয়ে দেয় ''আমি সুনয়নীর কাছে এমনি থাকব। সেবা-টেবার ত্রুটি হবে না। কিন্তু তার বদলে টাকা পয়সা গয়নাগাঁটি কিছু দিতে

পারবে না। আমি ওসব নেব না। ... তোমরা বড়লোক, ইচ্ছে করলেই দিতে পারো। কিন্তু ওসব আমার চাই না।"[৩৬] হেমকান্তর প্রতি নিঃস্বার্থ একমুখীন ভালোবাসা এবং হেমকান্তর নাবালক পুত্রকন্যার প্রতি গভীর মাতৃস্নেহ রঙ্গময়ী চরিত্রকে অসাধারণত্ব প্রদান করেছে। এক নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সে সুনয়নীর অলঙ্কারের যতটুকু অংশ বিশাখার প্রাপ্য তা বিশাখা পাইয়ে দিতে হেমকান্তর পুত্রকন্যাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। হেমকান্তর দ্বিতীয়া স্ত্রী হিসাবে সতীন সুনয়নীর অলঙ্কারের উপর রঙ্গময়ী নিজের অধিকারের কথা ঘোষণা করলেও সুনয়নীর অলঙ্কারে সামান্যতম অংশও সে নিজের ভোগের কাজে লাগায়নি। লোভী, স্বার্থান্বেষী পিতা বিনোদচন্দ্রের লোভ লালসার কাছে রঙ্গময়ী যেন এক জাগ্রত বিবেক। রঙ্গময়ীর নির্ভীক সততার কাছে পরাজয় মেনে বিনোদচন্দ্র ও তার পরিবারের জমিদার পরিবারের দিকে লোভ লালসায় প্রসারিত হস্ত সঙ্কুচিত হয়েছে। হেমচন্দ্রের আশ্রিত ও একসময় কৃপাপ্রাপ্ত এস্টেটের সমস্ত কর্মচারী যে যার নিজের বৃত্তে বিচরণ করতে যে বাধ্য হয়েছে তা কেবল রঙ্গময়ীর সক্রিয় ভূমিকার কারণেই। আসলে সততা এমন এক মানবীয় গুণ যার কাছে নত্যি স্বীকার করা ছাড়া মানুষের গতান্তর নেই। উপন্যাসে রঙ্গময়ী চরিত্রের সততা সেই সত্যই প্রমাণ করে।

রঙ্গময়ী যে কেবল তার সমকালের মানুষকে আচ্ছন্ন বা প্রভাবিত করেছিল তা নয়, বার্ধক্যে উপনীত হয়েও চারিত্রিক দৃঢ়তা, সত্য অবলম্বনে দ্বিধাহীনতা একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রাতিষ্ঠানিকতার চরম বিরোধী, পারিবারিক সম্পর্কের প্রতি আস্থাহীন, দ্বিধানীত চরিত্র ধ্রুবকেও আকর্ষণ করেছে। তাই নানারকম সমস্যার জটিল আবর্তে ঘূর্ণায়মান ধ্রুব আশ্রয়ের সন্ধানে রঙ্গময়ীর কাছে এসে "চুপ করে থাকে। রঙ্গময়ীর কাছে সে কেন এসেছে তা ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু এসে তার খারাপ লাগছে না। এযেন একটা প্রাচীন গাছের কাছে বসে থাকা। এ যেন পিদিমের আলোয় এক প্রাচীন পুঁথি পাঠ।"[৩৭] ধ্রুবর অন্তরআত্মা প্রকাশ পায় কেবল মাত্র এই নারীর সংস্পর্শে এসে। রঙ্গময়ীর দর্পণে ধ্রুব নিজেকে প্রত্যক্ষ করে এবং নিজের কৃতকর্মের বিচার করতে উদ্যত হয়। নোটনের মতো নষ্ট চরিত্রের মেয়ে ব্যক্তিত্বময়ী মনুপিসির কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে। নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখা সত্যের মুখোমুখি হবার ভয়ে, কৃষ্ণকান্তের মতো ব্যক্তিত্বশালী, রাজনীতির শীর্ষে অবস্থানকারী, প্রচণ্ড প্রভাবশালী ব্যক্তি তার নিঃসঙ্গ অসুখী পারিবারিক জীবনের দুঃখের ঝাঁপি খুলে বসেন যার কাছে সে হল একমাত্র রঙ্গময়ী। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংসারের নানা রঙের সমস্যাকে অন্তরে ধারণ করে সমস্যা থেকে উত্তরণের সঠিক পথের সন্ধান করতে করতে তিনি সদর্থে রঙ্গময়ীই হয়ে উঠেছেন।

রেমি— "এ দেশের মেয়েরা সহনশীলা। কথাটা সত্য বলে মনে হয় না হেমকান্তর। সহনশীলতা এক অনবদ্যগুণ, তা শিক্ষা করতে হয়। এদেশের মেয়েরা সয় বটে, কিন্তু সে দায়ে পড়ে। ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের আগুনে ফুঁসতে থাকে, আর সে আগুন বেরবার পথ পায় না বলেই অন্যবিধ রন্ধ খোঁজে।"[৩৮] এই উক্তি শীর্ষেন্দু মখোপাধ্যায়ের 'দূরবীন' উপন্যাসে অন্যতম চরিত্র হেমকান্তর। কিন্তু এই উপন্যাসেই রঙ্গময়ী, রেমির মতো নারীচরিত্ররা হেমকান্ত চৌধুরির এই উক্তিকে যেন খণ্ডন করে দিয়েছে। কারণ রঙ্গময়ীর মতো রেমি চরিত্র বর্ণনার ক্ষেত্রেও লেখক মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের প্রচলিত 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' এই আপ্তবাক্যকেই শিরোধার্য করে নিয়ে নারীচরিত্র রূপায়ণে অগ্রসর হয়েছেন। হেমকান্তর যোগ্যসঙ্গিনী তথা তার দ্বিতীয়া স্ত্রী রঙ্গময়ীর সমস্ত দোষগুণকে ছাপিয়ে যে গুণ আমাদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে তা হল স্বামী হেমকান্তর প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাশীলতা। হেমকান্তকে সুখ, শান্তি দিতে, তাঁর সাংসারিক সমস্যা সঙ্কুল জীবনকে নিরাপদ ও নির্বিষ করে তুলতে নীলকণ্ঠের মতো সংসারে সকলের উগরে দেওয়া গরলকে নিজের কণ্ঠে ধারণ করে, নিজের জীবন, পরিবার, লোকলজ্জা সব কিছুকে তুচ্ছ করে মহীয়সীর ন্যায় উপন্যাসে রঙ্গময়ী প্রতিভাত হয়েছে। উপন্যাসে রঙ্গময়ীর যোগ্য উত্তরসূরি চরিত্র রেমি।

উপন্যাসে নিতান্ত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে রেমি সুন্দরী, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা এবং সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত। এহেন রেমির বিয়ে হয়ে যায় জন্মসূত্রে সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের অন্তঃর্গত এবং কর্মসূত্রে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থানকারী প্রবল ব্যক্তিত্বশালী, গৌরবময় দেশপ্রেমের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পন্ন পুরুষ কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর সুপুরুষ পুত্র ধ্রুবর সাথে। এই পর্যন্ত রেমির জীবনে সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু রেমির জীবন তো গতানুগতিক ধারায় বহমান হবার নয়। কারণ তার স্বামী মন্ত্রী-পুত্র ধ্রুব যে পিতার উপর প্রতিশোধ লিপ্সায় মগ্ন হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়ে এক স্বেচ্ছাচারী, পীড়াদায়ক, খামখেয়ালিপূর্ণ জীবনযাপনের রাস্তাকে নির্বাচন করে নিয়েছিল। এতে সব থেকে বেশি বিপন্ন হয়েছে রেমির জীবন। বিবাহবাসরে ধ্রুবর নির্দিষ্ট সময়ে অনুপস্থিতি, জোর জবরদস্তি করে ধ্রুবকে বিবাহবাসরে ধরে নিয়ে আসা, এবং নববিবাহিতা রেমির ধ্রুবদের বাড়িতে পদার্পণের সাথে সাথে মদ্যপ ধ্রুবর দুর্ব্যবহার রেমিকে তার জীবনের সামনের দিনগুলির কঠিন লড়াইয়ের বার্তা পৌঁছে দেয়।

কৃষ্ণকান্তর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপকারী ধ্রুবকে কোলকাতা থেকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য দূরদর্শী কৃষ্ণকান্ত পুত্র ধ্রুব ও পুত্রবধূ রেমিকে দার্জিলিঙে হনিমুনে পাঠিয়ে দিলে সেখানে

একাকী নিঃসঙ্গ রেমি ধ্রুবর আর এক রূপের পরিচয় পায়। দায়িত্বজ্ঞানহীন ধ্রুব বর্ধমান স্টেশনে যুবতী রেমিকে একাকী ট্রেনে ছেড়ে নেমে যায়। ''আতঙ্কে জানালা দিয়ে রেমি তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, এই তুমি কোথায়, ওগো তুমি এসো শিগগির! গাড়ি ছেড়ে দিল যে! ... মরিয়া রেমি গাড়ির অ্যালার্ম চেন ধরে ঝুলে পড়ল, গাড়ি থামতেই সে নেমে পড়ল আগুন গরম প্লাটফর্মে তারপর ছুটতে লাগল পিছন দিকে। ... ধ্রুব নিবিষ্ট মনে হুইলারের দোকানে দাঁড়িয়ে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাছিল।''[৩৯] ''ধ্রুব ম্যাগাজিনটা বগলদাবা করে ধীরে সুস্থে দাম মেটাল। তারপর বলল, চলো। কিন্তু একটা কথা বলে দিচ্ছি। অবাধ্যতা করোনা। আমার কিন্তু কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই।''[৪০] ধ্রুবর কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় চরম প্রমাণ পায় রেমি দার্জিলিঙে হোটেলে অতিরিক্ত মদ্যপান করে আউট হয়ে যাওয়া এবং সর্বশেষে বাজারের কাছে একটা বারে মদ খেয়ে প্রচণ্ড হাঙ্গামা বাঁধানোর মধ্যে। ধ্রুবর এই লাগামহীন মদ্যপান এবং ব্যাখ্যাহীন আচরণ রেমির জীবনসমূহ বিপদ ডেকে আনে। অভিভাবকহীন দিশাহীন রেমি সেখানে উপস্থিত কৃষ্ণকান্তর বন্ধু সুদর্শনবাবুর ভাইপো সমীরকে অবলম্বন করে মুক্তির পথ খুঁজতে থাকে। আসলে বিয়ের পর থেকে কাণ্ডজ্ঞানহীন, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ধ্রুবর সঙ্গ তাকে তিলে তিলে পাগল করে তুলেছিল। তার ওপর আছে দেহ ও মনের যৌবনচিত চাহিদার দিনের পর দিন বঞ্চনা। কৃষ্ণকান্ত সুকৌশলে ধ্রুবকে সঠিক পথে চালনার যে গুরুভার তার ওপরে চাপাতে চাইছিলেন তাতেও তার মন বিদ্রোহী হয়ে থাকবে। ''ঠিক কী হয়েছিল তা বলা মুশকিল। ... রেমি পাগলের মতো গিয়ে দরজা খুলেই আঁকড়ে ধরল সমীরকে, আমাকে এক্ষুনি নিয়ে চলুন।''[৪১] কিন্তু রেমির মধ্যে দিয়ে যে পতিপরায়ণা সতীসাধ্বী মধ্যবিত্ত নারীকে লেখক রূপ দিতে চেয়েছেন তার তো ভ্রষ্টা হওয়া মানা। তাই তাকে on track রাখতে বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর দূরদর্শী পদক্ষেপ সক্রিয় কর্ষিকার মতো কাজ করেছে। উপন্যাসের এই স্তর পর্যন্ত মদ্যপ, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, ন্যায়নীতিহীন, পিতার প্রতি প্রতিশোধ স্পিহায় অন্ধ উন্মত্ত ধ্রুবর প্রতি রেমির বিশেষ কোন হৃদয় দুর্বলতার সৃষ্টি হয়নি। বরং দার্জিলিঙের পীড়াদায়ক ঘটনার পর রেমি ধ্রুবকে ডির্ভোস করার কথাও চিন্তা করেছে। যদিও শুরু থেকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেবার একটা অক্ষম প্রচেষ্টা রেমির মধ্যে লক্ষ করা যায়। তবুও তখন পর্যন্ত রেমি ধ্রুব দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী পরস্পরের প্রতি আকর্ষণহীন দুটি চরিত্র হিসাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তিত্বপূর্ণ, কর্মজীবনে চরম সাফল্যের শীর্ষবিন্দুতে অবস্থানকারী কিন্তু ব্যক্তিজীবনে নিঃসঙ্গ, নিরালম্ব কৃষ্ণকান্ত সুকোমল, আবেগপূর্ত, শ্রদ্ধাশীল, ভালোবাসার তীব্র আকাঙ্ক্ষি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এই যুবতীকে তাঁর স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে স্বামী প্রেমহীন

রেমির দাম্পত্য জীবনকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। কৃষ্ণকান্তের অসম্ভব স্নেহ ভালোবাসা যখন ধীরে ধীরে রেমিকে সংসারের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছে তখন থেকেই শুরু হয়েছে রেমির জীবনে আর এক নতুন অধ্যায়। জীবনের এই পর্যায়ে রেমিকে কেবল নিজের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। একদিকে স্বামী ধ্রুবর সঙ্গে দীর্ঘদিন একছাদের নীচে বসবাস করা এবং ধ্রুবর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব যা নারীদের মোহিত করে উভয়ের প্রভাবে রেমির মনে ধ্রুবর প্রতি হৃদয় দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে ধ্রুবর তীব্র অবজ্ঞা, স্ত্রী হিসাবে রেমিকে অস্বীকার রেমিকে ঢেলে দেয় অনিশ্চয়তার গহন গভীর খাতে। সেখান থেকে রেমি উদ্ধার পাওয়ার জন্য পাগলের মতো অস্থির হয়ে ওঠে। তাই ''সারা রাত ধরে সে নিজেকে প্রশ্ন করেছে, কেন এই মানুষটিকে আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না? এই মাতাল, খুনি, নিষ্ঠুর, উদাসীন ও অপ্রকৃতস্থ লোকটা কোন জাদু বলে আমাকে দখল করে আছে।"[৪২] তাই দ্বিধান্বিত ''রেমি ঝাঁপিয়ে পড়ল ধ্রুবর ওপর। বলো তোমার পাগলামি মাতলামি সব অভিনয়। সব ভাঁড়ামি। বলো তুমি অস্বাভাবিক নও! এত বুদ্ধি এত চোখ কখনও কোনও মাতালের থাকে? বলো! বলছ না কেন?"[৪৩] এই ভাবে যতই রেমি স্বামীকে বুঝতে চেয়েছে, কাছে পেতে চেয়েছে ততই ধ্রুব রেমির কাছ থেকে দূরে সরে যেয়ে নিজেকে রহস্যাবৃত করে তুলেছে। ''তোমাকে জানা আমার ফুরাইবে না।" স্বামীকে জানার নেশায় মগ্ন রেমি নিজেকে ভুলে আত্মপরিজনকে ভুলে এক অদ্ভুত খেলায় মেতে উঠেছে।

স্বামী প্রতি একমুখীন প্রেমে উন্মত্ত হিতাজ্ঞানহীন যোগিনী প্রায় রেমি আমাদেরকে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের চণ্ডীদাসের রাধাকেই সরণ করিয়ে দেয়। চণ্ডীদাসের রাধার পূর্বরাগের সঞ্চারে শ্যাম নাম শ্রবণে ''সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম", এ যেন প্রেমের মধুর মঙ্গল প্রভাতীসুর। শ্যাম নাম যেমন রাধাকে আকুল করে তেমনি ধ্রুবর নাম, ধ্রুব সম্পর্কিত যেকোনো রকম আলোচনা, সমালোচনা রেমির কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র তার হৃদয় স্পর্শ করে। চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রধান পাঁচ পর্যায়-শ্রীরাধার পূর্বরাগ, রসোদগার, আক্ষেপনুরাগ, বিরহ ও আত্মনিবেদন। রেমি-ধ্রুবর দাম্পত্যজীবনকে লেখক যেভাবে উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন তাতে প্রেম পিয়াসী রেমির জীবনেও কমবেশি রাধার প্রেম পর্যায়ের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কিশোরী রেমির চিত্তে প্রেমোন্মেষ ও তার পরিণতি দেখাতে গিয়ে বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাকে হয়তো বা অবচেতন মনে অনুসরণ করেছেন। প্রিয়তম/প্রিয়তমাকে নিজের দিকে আকর্ষিত করে তোলার সর্বাধিক জনপ্রিয় পদ্ধতি হল প্রিয়/প্রিয়ার মনে ঈর্ষা জাগ্রত করা। এর জন্য অবলম্বিত পথ হল পরপুরুষ বা পরস্ত্রীর প্রতি মেকী আকর্ষণ প্রদর্শন করা। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে নায়ক নায়িকারা এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীর আক্ষেপ অনুরাগের পদে তাই

রাধার সবচেয়ে বেদনাদায়ক আক্ষেপ ঃ ''সই কেমনে ধরিব হিয়া/আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়/ আমার আঙ্গিনা দিয়া।''[৪৪] এই উপন্যাসে বিরহ জ্বালায় জর্জরিত রেমি তার শ্যাম রূপ ধ্রুবর মধ্যে আক্ষেপনুরাগ জাগ্রত করার বাসনায় রাজাকে সামনে খাড়া করে মিথ্যা প্রেমের কাহিনি বুননের চেষ্টা করেছে।

একাকী নিঃসঙ্গ রেমির প্রায় রুদ্ধদ্বার জীবনে বাইরের সামান্য শুদ্ধ অক্সিজেন সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ রেমির জীবনের একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি দিয়ে তার জীবনে বৈচিত্র্য আনার আশায় রাজার মাধ্যমে বাইরের জগতের দরজা কৃষ্ণকান্ত রেমির সামনে খুলে দেন। কিন্তু অনেক সময় মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। রেমির সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচক্ষণ কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী চালে ভুল করে ফেলেন। রেমিকে সঙ্গ দিতে গিয়ে সুদর্শন স্মার্ট, শিক্ষিত যুবক রাজা রেমির প্রেমের পড়ে যায়। রেমি রাজার এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ধ্রুবর মনে প্রেম জাগিয়ে তোলার অক্ষম প্রচেষ্টা করে। ধীরে ধীরে রাজা রেমির হাতে দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হয়। যাকে অবলম্বন করে রেমি তার দাম্পত্য জীবনে কিস্তিমাত করতে সচেষ্ট হয়। রাজার প্রতি রেমির যে বিন্দুমাত্র হৃদয় দুর্বলতা নেই তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যখন সে রাজাকে বলে—''আমরা এমন বিহেভ করব যাতে ও (ধ্রুব) সত্যিই ভেবে নেয় যে আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করছি। তখন ও এত জেলাস হয়ে উঠবে যে জ্বলতে জ্বলতে এসে একদিন সারেন্ডার করবে।''[৪৫] বা যখন ''রেমি একটু লাল হয়ে বলে তোমার কুট্টিদা যদি আমাকে না-ই ভালবাসে তবে অন্য কাউকেও বাসে না। কিন্তু যদি কোনও দিন কাউকে ও তার ভালোবাসার ইচ্ছে হয় তবে আমাকেই বাসবে।''[৪৬] অপরদিকে ধ্রুব যেন যুগপুরুষ, রেমির কোন আচরণেরই কার্যকারণ তার কাছে অজ্ঞাত থাকে না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী, কঠিন বাস্তব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ধ্রুব রেমি চরিত্রকে খুব সহজেই পড়ে ফেলে। ফলে সে সচকিত হয় রেমিহীন রাজার জীবনের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে। এইভাবে রেমির ধ্রুবকে নিয়ন্ত্রণ করার সমস্ত পরিকল্পনা একের পর এক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আর ধ্রুবর কাছে বারবার হার মেনে রেমির অন্তর চূর্ণবিচূর্ণ হতে থাকে।

ভগ্নহৃদয় রেমির জীবনে সবচেয়ে বেশি আঘাত হানে ধ্রুবর সঙ্গিনী হিসাবে উপন্যাসের কাহিনি বৃত্তে ধারার উপস্থিতি। এর আগে ধ্রুবর বন্ধুদের রেমির বাপের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাদের লাম্পট্য প্রদর্শন, রেমির ভাইকে অকথিত ভাষায় গালিগালাজ এবং তার প্রতিক্রিয়ায় রেমির পিতার অসুস্থ হয়ে পড়া এছাড়াও রেমির গর্ভস্থ সন্তানকে মিথ্যা সন্দেহের বলে ধ্রুবর কুচক্রান্তে বিনস্ট করা, নোটন নাম্নী দূরসম্পর্কের এক মহিলার প্রতি ধ্রুবর সাময়িক দুর্বলতার প্রকাশ — এইসব ঘটনা রেমির মনে গভীর ছায়াপাত করেছিল। কিন্তু শ্বশুর কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী দুর্লভ অপত্যস্নেহ এবং

স্বামী ধ্রুব চৌধুরীর প্রতি বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসজাত ক্ষমাসুন্দর মানসিকতা রেমির মনে সেই ছায়াকে দীর্ঘস্থায়ি হতে দেয়নি। কিন্তু ধারার সম্মুখ উপস্থিতি এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ধারা ও ধ্রুবর সহজ সরল স্বীকারোক্তিতে রেমির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। ধ্রুবর উত্তরাধুনিক যুগের বিবাহ বহিঃর্ভূত নরনারী সম্পর্কের প্রতি আস্থা এবং সেই সম্পর্কিত ব্যাখ্যা, নিজেকে নিরপেক্ষ রাখার জন্য স্ত্রীর পাশাপাশি আর এক নারীর সঙ্গিনী হিসাবে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার কারণ দর্শানো এসবই রেমির কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। পরিস্থিতির চাপে পড়ে রেমির প্রায় মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটতে শুরু করে। তবুও রেমি ধ্রুবর প্রতি প্রেমে অবিচল থাকে। রেমির মতো এরকম পতিব্রতা, যোগিনীপারা একমুখীন নারী আধুনিক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে খুব কমই মেলে।

অপরদিকে ধ্রুবর জন্য রেমির এই আত্মোৎসর্গ উপন্যাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করে ফেলে। সেই কাজটি হল ধ্রুবর জীবনে গতিমুখ পরিবর্তন। ''এ বাড়ির বনিয়াদ। হাতের কাছে যা পাও তাই দিয়েই ভাঙতে শুরু করো। বাড়ি ভাঙো, মানুষ ভাঙো, সিস্টেম ভেঙে উড়িয়ে দাও।''[৪৭] এই আহ্বান জানিয়ে যে চরিত্রের যাত্রা শুরু এবং মাঝে মাঝে বোমা মেরে কৃষ্ণকান্তর বাড়িটাকেই উড়িয়ে দিতে যার ইচ্ছে করে সেটা পারে না বলেই অন্যভাবে অর্থাৎ আত্মপীড়নের মধ্যে দিয়ে যে প্রতিশোধ তুলে নিতে সচেষ্ট হয় সেই ধ্রুবর বাইরে খোলসের ভিতরে ধীরে ধীরে অন্য আর এক ধ্রুবর জন্মের সূচনা হয়। রেমির একমুখীন প্রেম, রক্ষণশীল মানসিকতা ধ্রুবর নবজন্মকে ধীরে ধীরে পরিণত রূপ দেয়। প্রকৃতপক্ষে ধ্রুবর অত্যন্ত আধুনিক, প্রথাবিরোধী, ভাঙনশীল কার্যকলাপ ছিল তার একেবারেই বাহ্যিক ব্যাপার। তার অন্তরে যে প্রাচীন পন্থি, রক্ষণশীল, প্রেমিক যুবাপুরুষ সুপ্ত ছিল রেমি তাকে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল মাত্র। জাগ্রত হৃদয় ধ্রুবর মনে ধীরে ধীরে যেমন রেমির প্রতি ভালোবাসার জায়গাটা পোক্ত হয়, তেমনি পিতা কৃষ্ণকান্তর প্রতিবিরূপ মানসিকতা দূরে সরে গিয়ে শ্রদ্ধাশীলতা বিকশিত হতে থাকে।

বিশাখা — ব্রিটিশ রাজত্বে ইংরেজদের একের পর এক সামন্ততন্ত্র বিরোধী নীতি ও বন্দোবস্তের কবলে পড়ে বাংলাদেশের জমিদার পরিবারগুলির যখন নাভিশ্বাস উঠে এসেছে এবং সময়ের সাথে ধীরে ধীরে সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তি এবং ধনতন্ত্রের বিকাশ যখন প্রায় সুনিশ্চিত সেই বিশেষ সময়ে সামন্ততান্ত্রিক সুলভ অহমিকা বোধ ও ঐশ্বর্যের গরবে গরিয়সী হেমকান্ত চৌধুরির কন্যা বিশাখার অদূরদর্শী আচরণ উপন্যাসে নতুন মাত্র যোগ করেছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে মা হল কন্যার সংসার জীবনের প্রথম এবং প্রধান শিক্ষাগুরু। শৈশবে মাতৃহারা বিশাখার সাংসারিক শিক্ষার একদিকে যেমন অভাব ঘটেছিল অপর দিকে জমিদার পরিবারে কন্যাসন্তান হবার কারণে বাইরের জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা তার বাস্তববুদ্ধি বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় হয়েছিল। ফলে

সীমায় বদ্ধ বিশাখার মধ্যে ছিল সামন্ততন্ত্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্যবোধ। অপরদিকে তারই ভাতৃবধূ চপলা ধনতান্ত্রিক পরিবারের সন্তান হওয়ায় এবং কলকাতায় নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হওয়ায় তার আচার আচরণে চিন্তাভাবনায় যুগোচিত আধুনিকতা প্রতিফলিত।

মাতৃহীন বিশাখার জীবনে বাবা হেমকান্তর দ্বিতীয়া স্ত্রী রঙ্গময়ী মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এই মহিলা তার বাস্তববুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে বিশাখার বিবাহ স্থির করে আর্থিক প্রতিষ্ঠার দিক থেকে উদীয়মান পরিবারের সন্তান রাজেন মোক্তারের ছেলে শচীনের সাথে। কারণ রঙ্গময়ী জানত সামন্ততন্ত্রের দিন শেষ। পেশানির্ভর বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের জয়যাত্রা শুরুর এই তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে শচীনের মতো শিক্ষিত কর্মদ্যোগী, পেশানির্ভর পাত্রই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু বিশাখার সহজাত সংস্কার জনিত অংমিকাবোধ তাকে বিপথে চালিত করে। তাই শচীনের বোন সুফলাকে ''বিশাখা বলে, উকিল-মোক্তারদের খুব কাঁচা পয়সা হয় বলে শুনেছি। আমাদের জমিদারিটা কিনে নিতে পারিস তোরা? সে ক্ষমতা আছে? ... আমাদের জমিদারি নেই বলে তো আর না খেয়ে থাকি না। তোদের ক'দিন পরেই হাঁড়ির হাল হবে।''[৪৮] বিশাখার অহমিকাবোধের চরম পরিচয়, আমরা পাই যখন সে শচীন ও তার বোন সুফলা সম্পর্কে রঙ্গময়ীকে বলে ওদের আমি মানুষ বলেই মনে করি না। শচীনকে বিয়ে করতে গররাজি বিশাখা রঙ্গময়ীর মাধ্যমে পিতা হেমকান্তকে জানিয়ে দেয়। বিশাখার পছন্দের পাত্র আর এক জমিদার কোকাবাবুর নাতি শরৎ। আবেগতাড়িত, অবোধ বালিকা বিশাখা কোকাবাবুর জমিদারির পদ্ধতি অবস্থার কথা বোঝে না, বুঝতে চায় না বন্দুক দিয়ে পশু স্বীকার করা শরতের বীরত্বের থেকে শচীন ও তার পরিবারের হৃদয়বত্তা, মহানুভবতা জীবনে চলার পথে অনেক বেশি মূলবান ও কার্যকরী। সে শুধু জানে ''ওদের (শচীন) বাড়ি ভাল নয়। কেমন সব গরিব স্বভাব।''[৪৯] হৃদয় ঐশ্বর্য নয় বাহ্যিক আড়ম্বরে বিশ্বাসী বিশাখাকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে উপন্যাসের প্লটে চপলা চরিত্রের আবির্ভাব।

চপলা — হেমকান্তর পুত্র কনককান্তির স্ত্রী চপলা ব্যক্তিগতভাবে দাম্পত্যজীবনে সুখী নয়। স্ত্রী হিসাবে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সেবা পরায়ণতা প্রভৃতি যেসব গুণাবলী মধ্যবিত্ত বাঙালি রমণীর দাম্পত্য জীবনের প্রধান অবলম্বন সাহেবি কেতায় বড় হওয়া চপলার মধ্যে যেসব গুণ বিন্দুমাত্র ছিল না। শচীনের কাছে তার স্বামীর প্রতি যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা এরকম ''পান্তাভাতের মতো পুরুষমানুষের ঘর করতে করতে আমার ভিতরটা মরে যাচ্ছে। এই যা দেখছেন ভালমানুষ বউ সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছি এটা আমার ছদ্মবেশ। সারাজীবন কি ছদ্মবেশ পরে কাটিয়ে দেওয়া যায়। সবসময় মনে হচ্ছে আমি অন্য এক নারী চরিত্রে অভিনয় করে যাচ্ছি মাত্র।''[৫০] শচীনকে সে এও জানিয়েছে ''বিয়ের ব্যাপারে কত অঘটন ঘটে। আমাকে দেখছেন না? আমার কি

কনককান্তির মতো ভেড়ার সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় কথা।"[৫১] স্বামীর প্রতি যে নারী এই অশ্লিল মন্তব্য করতে পারে সে নারী যে অসতী, ভ্রষ্টা হতেই পারে তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। চিরন্তন বাঙালি নারীর শাশ্বত ভাবমূর্তির মূলে কলঙ্ক লেপনকারী এই নারী বিশাখা দ্বারা প্রত্যাখিত শচীনকে বিশাখামুখী করার অছিলায় শচীনের সংস্পর্শে আসে এবং নিজে পথভ্রষ্ট হয় ভ্রষ্টচরিত্রে পরিণত করে শচীনকেও। পরপুরুষ শচীনের কাছে নিজের স্বামীর ও তার পরিবারের কুৎসা করে সে বলেছে ''আমার মতো সব দিক দিয়ে চৌকস মেয়েকে কি এ সংসারে মানায়। একটু পান থেকে চুন খসলেই এদের জাত যায়। আমার এত রেসট্রিকশন ভাল লাগে না বলেই কলকাতা পালিয়ে গেছি। কিন্তু গেলে কী হবে। যাকে নিয়ে জীবন সেই তো জলঘট।"[৫২] অর্থাৎ কনককান্তিকে তার পরিবার থেকে উৎখাত করার পিছনেও এই কুচক্রী অসতী মহিলা কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। সংসার গড়া নয় সংসার ভাঙাতেই এই নারী যেন সিদ্ধহস্ত।

হেমকান্ত পুত্রবধূ চপলাকে দায়িত্ব দেন মাতৃহারা বিশাখাকে শচীনমুখী করে বিশাখার জীবনে পরিপূর্ণতা আনার। কিন্তু ভ্রষ্টা নারী চপলা নিজেই শচীনের সাথে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয় এবং কলঙ্কিত করে তোলে হেমকান্ত চৌধুরীর পুরো পরিবারকে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্যের অনুকরণে জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই নারী আসলে পরিবার ও সমাজকে ধারণ, রক্ষণ ও উন্নয়নে অক্ষম। ''লোকে বলে, এদেশের মেয়েরা ভারী সহনশীলা। কথাটা সত্যি বলে মনে হয় না হেমকান্তর। সহনশীলতা এক অনবদ্য গুণ, তা শিক্ষা করতে হয়। এদেশের মেয়েরা সয় বটে, কিন্তু সে দায়ে পড়ে। ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের আগুন ফুঁসতে থাকে, আর সে আগুন বেরোবার পথ পায় না বলেই অন্যবিধ রন্ধ খোঁজে।"[৫৩] চপলার ক্ষেত্রে তার অন্তরের বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত করার অবলম্বন হয় শচীন। কারণ ''সেই কুমারী বয়স থেকে যে পিপাসা তার বুকের মধ্যে ছিল তা আজও রয়ে গেছে। কনককান্তি সে পিপাসা মেটাতে পারেনি। সে সাধ্যই তার নেই। সেই আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে যৌবনের এই দামাল দিন পার হচ্ছে সে। কিন্তু পার হওয়া কি সোজা?"[৫৪] কিন্তু দীর্ঘদিন হেমকান্তর পরিবারের সঙ্গে একত্রে বসবাস, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব চপলার মনোজগতে এক পরিবর্তন আনে। আধুনিকা উদার মনস্ক চপলার মধ্যে ধীরে ধীরে সংস্কার দানা বাঁধতে থাকে। তাই বেপোরোয়া চপলা যখন সংস্কারী চপলায় পরিণত হয়েছে তখন ''কনককান্তির প্রতি তার বিরাগ নেই, অনুরাগও নেই। আছে থাক না, এরকম মনোভাব। শচীনের প্রতিও যে সে কোনও বাঁধন-ছেঁড়া আকর্ষণ অনুভব করে তা-ও নয়। সে শচীনকে অন্যরকম চেয়েছিল। একজন রূপমুগ্ধ ভক্ত। অঢেল প্রশংসাবাক্য, চাটুকারিতা আর মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে প্রতিদিন বিধৌত করে দেবে তাকে। কিন্তু খুব কাছে আসবে না, অন্তত সেরকম সাহস হবে না। চপলা ও দাক্ষিণ্য দেখাবে বই

কী। কখনও সখনও দু-একটা স্তোক, একটু-আধটু দৃষ্টির প্রসাদ, সামান্য হাসির দাক্ষিণ্য।"[৫৫] চপলা চরিত্রের এই রূপান্তরের পিছনে সব চেয়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে হেমকান্তর ছোটপুত্র কৃষ্ণকান্ত চৌধুরি। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং যোগী পুরুষের ন্যায় সংযমী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়েও চপলার সকল ত্রুটি ভুলে তার প্রতি কৃষ্ণকান্তের শ্রদ্ধাশীল মানসিকতা চপলার জীবনদর্শনকেই বদলে দিয়েছে।

অপরদিকে শচীন-চপলার অবৈধ সম্পর্ক পরিবর্তন সাধন করে বিশাখা চরিত্রেরও। আসলে বিশাখার হৃদয়ের অভ্যন্তরে শচীনের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। জমিদারিসুলভ মেকী দাম্ভিকতার মোহজালে আচ্ছন্ন বিশাখা আপনার হৃদয়ে লুকায়িত সত্যকে অনুধাবন করতে পারেনি। চপলার শচীনের প্রতি আকর্ষণ ধীরে ধীরে বিশাখাকেও শচীনমুখী করে তোলে। মিথ্যা দাম্ভিকতার অবসান হয় বিশাখার অন্তর থেকে। এতদিন যে শচীনকে সে হীন চোখে দেখেছে সেই শচীনের প্রতি তার হৃদয়ের আকর্ষণ দুর্বার হয়ে ওঠে। আর শচীনের হাতে চড় খাওয়ায় পর ''সারাটা দুপুর বিশাখার কাটল ফের অন্যরকম এক ঘোরের মধ্যে। চড় খাওয়ার অপমান বুক থেকে নেমে গেছে। এখন সে ভাবছে শচীন তাকে কোলে করে দোতলায় তুলেছিল। শচীন তিন দিন জলস্পর্শ করেনি। যত ভাবছে তত বুকের চিনচিন ব্যথাটা নাড়া খাচ্ছে। অস্ফুট এক ব্যথা বড় অদ্ভুত। বড় সুখদায়ক।"[৫৬] বিশাখা চড় মারার পর শচীনেরও বিবেক জাগ্রত হতে থাকে। চপলার প্রভাব তার হৃদয়ে মলিন হতে থাকে। ধীরে ধীরে বিশাখার প্রতি অনুরাগের রঙে রঞ্জিত হয় শচীনের হৃদয়। অবৈধ প্রণয়ের মতো গর্হিত কাজ থেকে মুক্তি পায় চপলা এবং শচীন উভয়েই। আসলে বিশাখাকে শচীনমুখী করে তোলার জন্যই উপন্যাসের প্লটে শচীন-চপলার অবৈধ প্রেমে কাহিনি অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু উপন্যাসের সমাপ্তিতে শচীন-বিশাখার সুখী দাম্পত্য জীবনের বর্ণনার মাধ্যমে লেখক শাশ্বত বৈধ প্রেমেরই জয়গান গেয়েছেন। আসলে সামন্ততন্ত্রের পতনের কালে সামন্ততন্ত্রেরই ধ্বংসস্তূপ থেকে সঞ্জীবনী সুধা গ্রহণ করে পেশাভিত্তিক মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল এবং তা ধীরে ধীরে সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষদের কাছে তা গ্রহণীয়ও হয়ে উঠেছিল উপন্যাসে বিশাখা, চপলা শচীন চরিত্রগুলি ইতিহাসের সেই সত্যকেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।

(ঘ) 'মানব জমিন'

''ভারতবর্ষে নারী দেবীরূপে পূজিতা। নারীশক্তির জয়ধ্বনি ওঠে উৎসবে পার্বণে। কিন্তু এই ধর্মীয় বিশ্বাসের বাইরে দেশের বাস্তব চিত্রটি কিন্তু একেবারেই বিপরীত। নদী থেকে অরণ্য সবকিছুকেই যে-দেশে 'মা' রূপে পূজো করা হয়, সেখানেই নাকি মেয়েদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ।

শিশুকন্যার মৃত্যুর হারও বিশ্বের সবচেয়ে বেশি এদেশেই। সম্প্রতি এমনটাই জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের আর্থ-সামাজিক বিভাগের (ইউ-এস-ডেসা) রিপোর্ট। রিপোর্টে জানা যায় সারা বিশ্বেই এখন শিশু মৃত্যুর হার নিম্নগামী। শিশুকন্যার মৃত্যুর হারও কমেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এখনও এদেশের ছেলেদের তুলনায় এক থেকে পাঁচ বছর বয়সি মেয়েদের মৃত্যুর হার ৭৫ শতাংশ বেশি। মৃত্যুর হারের এই পার্থক্যকে লিঙ্গ বৈষম্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বলে ব্যাখ্যা করেছে রিপোর্ট।"[৫৭] এই হল একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের মেয়েদের জীবন বাস্তবতার ছবি। এরপর আমরা আলোচনার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করে পুরোনো বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি সমাজের দিকে তাকালে দেখবো মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রামায়ণের অনুবাদক চন্দ্রাবতী ছাড়া আর কোন মহিলার লেখনী ধারণের কোন প্রমাণ নেই। আসলে সে যুগের সমাজ নারীদের সেভাবে বিকশিত হবার সুযোগ দেয়নি। সারা মধ্যযুগের সমাজ ও সাহিত্য জুড়ে পুরুষদেরই একাধিপত্য আমরা লক্ষ্য করি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীজাগরণের বিষয়টির সূত্রপাত মূলত পুরুষদের হাত ধরেই। পরবর্তীকালে অবশ্য নারীদের সক্রিয় ভূমিকাতেই বিষয়টি পুষ্টতা লাভ করে। আর আধুনিককালে নারীশিক্ষার বিস্তার ও চাকরির নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত হওয়ায় বাঙালি নারীসমাজের এক বৃহৎ অংশ এখন গৃহের বাইরে কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে এসেছে। এতে নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন যেমন এসেছে তেমনি সমাজে নারীর স্বাধীন মেলামেশার সুযোগ ও প্রয়োজন বেড়েছে। ফলে তার জীবনে দেখা দিয়েছে নতুন নতুন সমস্যা। ঔপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মানব জমিন' উপন্যাসে আধুনিক মধ্যবিত্ত নারীর এই বিচিত্র সমস্যার যে রূপরেখা অঙ্কন করেছেন তার স্বরূপ উন্মোচন করা হবে আমাদের এই আলোচনায়।

তৃষা — অরণ্যে প্রতিপালিতা কোন নারীকে সংসার জীবনে প্রতিষ্ঠা করলে পরিণতি কি হয় তা পরীক্ষা বা প্রমাণ করাই ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) উপন্যাস রচনার মূল কারণ। আর বিংশ শতাব্দীতে নারীচেতনা, নারীমুক্তি, নারী-স্বাধীনতা, নারীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতি শব্দগুলি নিয়ে যখন বাঙালি সমাজে তোলপাড় চলছে তখন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে একজন নারীকে পারিবারিক ক্ষমতার কেন্দ্রে বসালে তার কি পরিণতি হয় সেই পরীক্ষারই প্রমাণ আমরা পাই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সৃষ্ট 'মানব জমিন' উপন্যাসে তৃষা চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

ঔপন্যাসিক চরিত্রটিকে উপস্থিত করেছেন এইভাবে ''ব্যক্তিগতভাবে তৃষার নিজের তেমন কোনও লোভ নেই। সে সোনার গয়নার জন্য হেঁদিয়ে মরে না। শাড়ি বা রূপটানের জন্য আকণ্ঠ কোনও লোভ নেই। সে শুধু চায় একটা ছোটখাটো রাজত্বের ওপর নিরঙ্কুশ প্রভূত্ব করতে।"[৫৮] এহেন তৃষাকে স্বামী শ্রীনাথ শুরুর দিকে অসচেতন বা কিছুটা সচেতনভাবে ব্যবহার করেছে। এবং

অর্থনৈতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় দাদা মল্লিনাথের সম্পত্তি হস্তগত করার গোপন ইচ্ছা নিয়ে তাকে অবিবাহিত সুপুরুষ দাদা মল্লিনাথের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সবরকম সংস্কার মুক্ত নারী তৃষা তার সেবা, প্রেম ভালোবাসা দিয়ে বশীভূত করেছে মল্লিনাথকে। এবং মল্লিনাথের সম্পত্তির একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেছে সে। তৃষা অত্যন্ত সুকৌশলে ও দূরদর্শিতার সঙ্গে মল্লিনাথের সম্পত্তি দেখভাল করেছে এবং পরবর্তীকালে সম্পত্তির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন করা নারী তৃষার কাছে ''সতীত্ব বা এককেন্দ্রীক জীবন কত না অর্থহীন। কতই না হাস্যকর শব্দ ভালোবাসা। রাজার আমলের টাকার মতোই তা অচল। মল্লিনাথের সংস্পর্শে এসে সে যখন দারিদ্র্য মোচনের পথ দেখলো তখন কোন মানসিক বাধাই তাকে আটকে রাখেনি। লোকে বলে অবৈধ সম্পর্ক। কিন্তু তাই কি? তৃষা কোন পুরুষকেই ভালোবাসে না বটে কিন্তু তবু তার যেটুকু স্নেহ এখনও বুকের তলানিতে পড়ে আছে তার যোগ্য পুরুষ সারাজীবনে ওই একজনকেই পেয়েছিল তৃষা। সে মল্লিনাথ। ওই একজনকেই তার পরপুরুষ বলে মনে হয়নি কোনওদিন। বরং ওই একজনের প্রতি মানসিক বিশ্বস্ততাই তাকে খানিকটা সতীত্ব বা ওই ধরনের কিছু দিয়েছে।''[৫৯] আবার মল্লিনাথের দান করা পাঠশালার জমি উদ্ধারের কাজে প্রধান বাধা রাজনৈতিক কর্মী শুভঙ্করকে কব্জা করতে তৃষা তার সুন্দরী আধুনিকা এলাহাবাদবাসী মেয়ে চিত্রলেখাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করার আগে একবারও ভেবে দেখেনি বরং তার উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় সে খুশিই হয়েছিল।

চিত্রলেখার মোহের ফাঁদে মুগ্ধ হয়ে শুভঙ্কর নখদন্তহীন হয়ে গেছে। তৃষার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে শেষ হয়ে গেছে শুভঙ্কর। বদ্রীর সঙ্গে শ্রীনাথের জমি সংক্রান্ত কথাবার্তা তৃষার অগোচরে থাকেনি। সে আড়াল থেকে শ্রীনাথের বিরুদ্ধে গিয়ে বদ্রীকে নিয়ন্ত্রত করতে থাকে। শ্রীনাথের ছোটভাই সোমনাথ যে মল্লিনাথের সম্পত্তির দাবি করে বসে তাকে তৃষা দক্ষতার সঙ্গে কখনো বা কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। এইভাবে তৃষা যতই সাংসারিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছে, সর্বজনের কাছে তার মান্যতা স্বীকৃত হয়েছে ততই শ্রীনাথ তার কাছ থেকে নিজেকে দূরে স্থাপন করেছে। একদিকে সাংসারিক ক্ষমতা বা আধিপত্য ভোগের আস্বাদনে আস্বাদিতা ব্যক্তিত্বময়ী, তেজস্বিনী নারী অপরদিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সংসার নিয়ন্ত্রণে ভূমিকাহীন, ক্ষমতাশূন্য পুরুষের নারীর ক্ষমতা ভোগের অসহনীয় যন্ত্রণা তৃষা ও শ্রীনাথকে সংসারের দুই বিপরীত মেরুতে স্থাপন করেছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র 'ইগোর' লড়াই। যা পরবর্তীকালে দুজনের মধ্যে জন্ম দিয়েছে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ঘৃণার। তাই তৃষার ঘরের সামনে রাত্রিবেলায় কেউ তাকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে বোমা বিস্ফোরণ ঘটালে সন্দিহান হয়ে ''খুব তীক্ষ্ণ চোখে শ্রীনাথকে লক্ষ করে তৃষা। হয়তো অভিনয়। সে ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারে না। বলে আমাকে

ছাড়া আর কাকে? আমার তো শত্রুর অভাব নেই। কিন্তু এতটা আগে কখনও হয়নি। তুমি কিছু জানো না?"[৬০] পরবর্তীকালে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার আকস্মিকতায় ভীত, অসুস্থ শ্রীনাথকে দেখে "এ লোক যে তৃষাকে খুন করানোর জন্য লোক লাগাতে পারে না, তা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারছে তৃষা। কিন্তু সন্দেহের একটা আলপিন তবু ফুটে থাকে তার মনের মধ্যে।"[৬১] সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন ও বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে কঠোর তৃষার যান্ত্রিকতার কাছে সরে গেছে তার পুত্রকন্যা ও আপনজনেরা। নস্ট হয়ে গেছে পরিবারের আপনজনদের মধ্যে আন্তরিকতার সম্পর্ক।

সনাতনপন্থী লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তৃষা চরিত্রের মধ্যে ঠাকুর (শ্রীশ্রী অনুকূল চন্দ্র) কল্পিত নারীর কল্যাণময়ী মূর্তিটি খুঁজে না পেয়ে হয়তো বা হতাশ হয়েছেন। লেখকের সেই হতাশাই চরিত্রটিকে যেন ধীরে ধীরে ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। তৃষার পুত্র সজল মায়ের পক্ষ ত্যাগ করে বাবা শ্রীনাথের পক্ষ অবলম্বন করেছে। এবং মাকে জব্দ করার জন্য মায়ের শত্রুপক্ষ হিসাবে সে নিজেকে তৈরি করেছে।প্রবল বিচক্ষণশীল মহিলা তৃষার কাছে এ সত্য গোপন থাকেনি। তাই সজল সম্পর্কে তৃষার মনোভাব "এখন আরও বুদ্ধিমান, আরও হিংস্র আরও তৎপর মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে হবে তাকে, যাদের ওপর কিছুতেই আধিপত্য বিস্তার করা যাবে না।"[৬২] স্বামী পুত্রের সঙ্গে অলঙ্ঘনীয় দূরত্ব রচিত হবার পর ধীরে ধীরে তৃষা নিজের মধ্যে অনুভব করেছে গভীর একাকিত্ববোধ। তাই তৃষার মনে হয় "এত কষ্টে আমি যা করেছি সব এখন ছাই বলে মনে হয়। অথচ কষ্ট তো করেছি। এগুলো তো যাকে তাকে বিলিয়ি দিতে পারি না।"[৬৩] এবং মা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে, নারী হিসাবে নিজের ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নিয়ে "তৃষা হঠাৎ আবার উদাস হয়ে বলল তাই হবে। একটা দিক বাঁধ দিতে গিয়ে আমার অন্যদিকটা ভেসে গেছে।"[৬৪] তৃষা চরিত্রের চারিত্রিক দৃঢ়তার পতনের সংবাদ আমরা তৃষার এইসব সংলাপ থেকে পরিষ্কার বুঝে নিতে পারি। এ পতন যেন শুধু পারিবারিক বৃত্তে তৃষার আধিপত্যের পতনের কথাই বলে না এ যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর একাধিপত্যের পতন ঘটিয়ে পুরুষেরই জয়জয়কার ঘোষণার সূচনাকে ইঙ্গিত করে। এই পরিস্থিতিতে তৃষা ধীরে ধীরে নিজেকে উন্মোচন করেছে দেওর দীপনাথের কাছে। কিছুটা মানসিক আশ্রয়ও তৃষা লাভ করেছে দীপনাথের কাছে। দীপনাথকে উপরওয়ালা মেনে তার কাছে আত্মসমর্পণের জন্য তৃষার অস্থিরতা আসলে সমাজে পুরুষ শক্তির কাছে নারী শক্তির আত্মসমর্পণকে ইঙ্গিত করে। তাতে যেন নারীর নিজেরও পরমতৃপ্তি। আসলে উপন্যাসে তৃষা তার বিপরীতে পুরুষ চরিত্রগুলি এবং সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে লেখক দেখালেন আমাদের বিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ নারীদের আধিপত্য মেনে নিতে এখনো প্রস্তুত নয় হয়তো বা আধিপত্য বিস্তার বা তাকে ধরে রাখার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত নয় বাঙালি নারীও। তাই দীপনাথের কাছে

তৃষার আত্মসমর্পণের মধ্যেই রয়েছে চরম ও পরম শান্তির ঠিকানা।

বিলু — আধুনিক জীবনে অতিনাগরিক বৈদগ্ধের ফলে আমাদের বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে নারীদের জীবন থেকেও সারল্য ও আন্তরিকতা বিদায় গ্রহণ করেছে। তাদের কথা ও কাজের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট ব্যবধান। আধুনিক নারীর শিক্ষাদীক্ষায়, সামাজিক আচার-আচরণে এমনকি তাদের প্রেম ভালোবাসায় যে মিথ্যাচার আত্মগোপন করে আছে তার আবরণ উন্মোচন করার প্রবণতা থেকে শীর্ষেন্দুর 'মানব জমিন' উপন্যাসে বিলু চরিত্রের অবতারণা। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিলু চরিত্রটিকে আমরা আপাদমস্তক দ্বিচারিণী চরিত্র হিসাবে প্রতিভাত হতে দেখি।

বিবাহিতা বিলুর স্বামী প্রীতমের কাছে প্রেমিক অরুণ সম্পর্কে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ''ওর সঙ্গে আমার ভাব ছিল। খুব ভাব। হয়তো বিয়েও করতুম... ও ভীষণ মেয়েদের সঙ্গে মিশত। বাছবিচার ছিল না। ওরকম পুরুষ একটু আনফেথফুল হয়। ... তার ওপর অরুণ আবার ভীষণ ফ্রি।''[৬৫] বিলু সহজে ভয় পায় না আবার সহজ আবেগে ভেসেও যায় না। অত্যধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এই নারীর মধ্যে জন্ম দিয়েছে এক আবেগহীন যান্ত্রিকতার। তাই বিলুর অসুস্থ স্বামী প্রীতমকে ''সেবার মধ্যে কোথায় যেন দক্ষ নার্সের পটুত্ব আছে। কোন আবেগ নেই, অন্য কারও স্বামীর এরকম শক্ত অসুখ হলে চোদ্দোবার কেঁদে ভাসাত, বিলু একদিনও চোখের জল ফেলেনি। কিন্তু যারা কেঁদে ভাসায় তারাও হয়তো ওষুধ দিতে এক আধবার ভুল করে, রোগির সেবা করতে করতে হয়তো বা কখনও বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলে। বিলুর সেরকম ভুল হয় না, বিরক্তির প্রকাশও তার নেই। তবে বিলুর মুখে সর্বদাই গম্ভীর বিষণ্ণ, যে স্থায়ী বিরক্তির ছাপ আছে তার সঙ্গে প্রীতমের অসুখের কোন সম্পর্ক নেই।''[৬৬] বিলুর আবেগহীন ভালোবাসার স্বীকার প্রীতম-বিলুর কন্যা লাবুও। শিশুমনের সহজ সরল্য তার দুষ্টুমিষ্টি আচরণ শিশুসুলভ ভালোবাসার দাবি বিলুর মানব উপর কোন রেখাপাত করেনি। কমনীয় করে তুলতে পারেনি বিলু চরিত্রের যান্ত্রিক বাস্তবতাকে। প্রতিমুহূর্তে দুরারোগ্য ব্যাধির বিরুদ্ধে ইচ্ছাশক্তির জোড়ে লড়াই করে টিকে থাকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রীতমের ইচ্ছাশক্তির প্রতি বিলুর আস্থাহীনতা বিলুর স্বামী প্রেমের একাগ্রতার প্রতি প্রীতমকে সন্দিহান করে তুলেছে। বিলুর কাছে আসলে প্রীতম একজন মানুষ ছাড়া বিশেষ কেউ নয়। তাই প্রীতমের জন্য তারকেশ্বরে মানত করতে যাওয়ার প্রসঙ্গে ''সে অরুণকে নীরস গলায় বলল যদি বুঝি তাতে কাজ হবে তাহলে তাও করবো। একজন মানুষের জন্যই করবো তো।''[৬৭]

এহেন বিলু মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর অনিশ্চিত জীবনজীবিকার উপর নির্ভর না করে নিজেই পয়সা উপার্জনের রাস্তা খুঁজে নেবে এটাই স্বাভাবিক। তাই ''একটা শ্বাস ফেলে বিলু বলল, প্রীতম তো বাঁচবে না, সেজদা তারপর আমার আর লাবুর কী হবে? কে দেখবে আমাদের।''[৬৮] অরুণের

বাবার আনুকূল্যে বিলুর একটা ব্যাঙ্কের চাকরিও জুটে যায়। পেশার সূত্রে বাইরের জগৎ যতই বিলুর কাছে উন্মুক্ত হয়েছে ততই স্বামী, কন্যার প্রতি কর্তব্য নিষ্ঠার যে আবরণ দ্বিচারিণী বিলুর চরিত্রের উপরের আচ্ছাদন ছিল সেটাও ধীরে ধীরে খসে পড়েছে। তাই বিনা দ্বিধায় সে অসুস্থ স্বামী ও মেয়ের দেখাশোনায় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে অচলা নামে কাজের মেয়ের উপর। অপরদিকে অরুণের সঙ্গে বিলুর সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ধীরে ধীরে শোওয়ার ঘরে চার দেওয়ালে আবদ্ধ হয়েছে। হয়তো প্রীতমের দীর্ঘকালীন শারীরিক পঙ্গুত্ব বিলুকে অরুণমুখী করে তুলেছে। তার মানসিক অবসাদ ও শারীরিক চাহিদা মেটানোর জন্যই সে অরুণকে আশ্রয় করেছে। এক্ষেত্রে বিলুর আচরণ কিছুটা হলেও লেখক যুক্তিসঙ্গত করে তুলতে পারতেন। কিন্তু লেখক বিলু চরিত্রকে যেভাবে নির্মাণ করেছেন তাতে চরিত্রের মধ্যে সে অবকাশ তিনি রাখেননি। সেদিক থেকে বিলু চরিত্রটি লেখকের সহানুভূতি অর্জনে ব্যর্থ বলে আমাদের মনে হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি শীর্ষেন্দুর কাম্য শাশ্বত সেই ভারতীয় নারীর। যে নারীর তার সেবা, প্রেম, ত্যাগ, তিতিক্ষা দিয়ে সর্বংসহা হয়ে ধাত্রীরূপে সারা সংসারকে ধারণ করে থাকে। তাই শিক্ষিতা চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত এই মহিলার পদস্খলন লেখক মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারেননি। তাই লেখকের হতাশার প্রতিফলন ঘটেছে প্রীতম চরিত্রের মধ্য দিয়ে। এখানে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিসত্তা তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তাকে ছাড়িয়ে গেছে বলেই মনে হয়। অপর দিকে দ্বিচারিণী বিলুর এই আচরণ প্রীতমের কাছে গোপন থাকেনি। তাই প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার জন্য রোগ জীবাণুর সঙ্গে লড়াইয়ে মগ্ন প্রীতম বলে— ''দুনিয়ায় সম্পর্কটার কোনও মানে নেই, এ দুনিয়ায় কে কার ভাই, কে কার বউ তাদিয়ে কী হয় বল তো? মারা গেলে কোন অসীম অন্ধকারে হারিয়ে যাব সবাই, কে কার থাকবে।''[৬৯] বিলুর আচরণে চরম আঘাত পেয়ে প্রীতম ভাই শতমের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু সেখানেও বিলুর স্বামীর উপর অধিকারবোধ প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রীতমকে উত্তরবঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে ভাই শতমের যুক্তির কাছে হার মেনে বিলুর আবার প্রতিক্রিয়া এরকম— ''বিলু শতমের জ্বালা ধরানো কথাগুলো নিয়ে ভাবল না আর। ভাববে কেন? ওর দাদাকে ও নিয়ে যাক। বিলুর পৃথিবী যেমন ছিল তেমনই থাকবে। হয়তো আর একটু স্বাধীনতার স্বাদ পাবে সে। একটু মন কেমন করবে প্রীতমের জন্য তা করুক। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গিয়ে কতলোক কত শোক তাপ সহ্য করে।''[৭০] উত্তরবঙ্গে গিয়েও বিলুর কর্তৃত্বের হাত থেকে মুক্তি পায়নি প্রীতম। দ্বিচারিণী বিলুর প্রীতমের উপর আধিপত্য খাটানোর চেষ্টা, প্রীতমের বাড়ির লোকের প্রতি বিলুর সন্দিহানপূর্ণ দুর্ব্যবহার প্রীতমের মনকে আরও ভেঙেছে। তাই বিমর্ষ প্রীতম সমস্ত রকম পারিবারিক বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ইচ্ছাশক্তির মন্ত্রে শক্তিমান হয়ে নিরুদ্দেশ্যের দিকে নীরব যাত্রা

করেছে। উপন্যাসে প্রীতমের এই করুন অনিশ্চিত পরিণতির একমাত্র কারণ হয়েছে বিলু।

মণিদীপা — 'মানব জমিন' উপন্যাসে মণিদীপা হল জীবন বোধের গভীরতাহীন, অদূরদর্শী, কথা ও কাজের মধ্যে স্ববিরোধীতায় পূর্ণ একটি নারীচরিত্র। আসলে প্রত্যেক পরিবর্তন বা বিপ্লব কাঙ্খিত ফলের পাশাপাশি কিছু অবাঞ্ছিত অনভিপ্রেত ফলকে অসচেতনভাবে বহন করে আনে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি সমাজে যে নারী জাগরণের সূচনা, বিংশ শতাব্দীর নানা আন্তঃর্জাতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যা চরম রূপ পায় এবং যার প্রভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে নারীদের জীবনযাপনের ধরন পাল্টে যায় মণিদীপার মতো নারীচরিত্র সেই পরিবর্তনেরই অবাঞ্ছিত ফল। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজজীবনে পরিবর্তন ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এই নারী হয়ে উঠেছে স্বেচ্ছাচারী বিপথগামী।

উপন্যাসে আমরা দেখি মণিদীপা অত্যন্ত সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। তার বাবা একজন সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী। যার সংসার নির্বাহ হয় অত্যন্ত কষ্টে। সামান্য প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মীর পেনশন ভাতার উপর তার পুরো সংসার নির্ভরশীল। এহেন পরিবার থেকে উঠে আসা মণিদীপা যে বিবাহসূত্রে বর্তমানে সমাজে এলিট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তাকে এক পোশাকে দু'দিন কখনও দেখেনি দীপ। স্বামী মিঃ বোসের উপর অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়েও মিঃ বোস সম্পর্কে তার মন্তব্য — ''আমি কোনও বড় লোককেই সহ্য করতে পারি না। বিশেষ করে ওর মতো হামবাগ স্লেভ একজিকিউটিভদের। আমি ওকে জাংকারপট করে ছাড়ব। আর কিছু না পারি ওর সমস্ত সেভিংসকে উড়িয়ে দেওয়ার পথ খোলা আছে। আমি ওকে ভিখিরি করে ছেড়ে দেব।''[৭১] মণিদীপা নিজেকে শ্রমিক বলে মনে করেছে। এবং তার সেই শ্রম নাকি উৎসর্গীকৃত লেফটিস্ট পলিটিকসের জন্য। লেফটিস্ট পলিটিকসের ফাঁদ পেতে অত্যন্ত ধূর্ত স্নিগ্ধদেব চ্যাটার্জি মণিদীপাকে ফাঁসিয়েছে। যে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন সেই এলিট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মিঃ বোসের বেশ কিছু পরিমাণে টাকা স্নিগ্ধদেব আত্মসাত করেছে মণিদীপার মাধ্যমে। চরম অদূরদর্শী মহিলা মণিদীপা তা বুঝেও স্নিগ্ধদেব সম্পর্কে নির্বিকার থেকেছে। মণিদীপার এই আচরণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ পাঠক খুঁজে পায় না।

আসলে পলিটিকস্ মণিদীপার কাছে রোমান্টিক বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। লেফটিস্ট পলিটিকসের প্রাথমিক পাঠ পর্যন্ত তার মধ্যে ছিল না। তাই দেশের বহু মানুষ যখন বুভুক্ষু তখন একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে তার মন্তব্য ''ওই যে খাওয়ার কথা। খাওয়াটা এমন বড় প্রবলেম কি?''[৭২] এই মন্তব্য একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উপন্যাসে মণিদীপাকে দেখি নিজেকে অত্যন্ত আধুনিক এবং নিজের স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব জাহির করার প্রয়াসে রত মহিলারূপে। তাই

স্বামীর অধঃস্তন দীপনাথ তাকে মিসেস বোসের পরিবর্তে মণিদীপা বললে সে খুশি হয়েছে। এবং বিবাহও তার কাছে ম্যান-উওম্যান রিলেশন ছাড়া কিছু নয়। ত্যাগ, তিতিক্ষা, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়া এইসব আধুনিক নারী মণিদীপার কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়েছে। আধুনিকতা বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের যে স্বরচিত মেকী মুকুট মণিদীপা তার শিরে ধারণ করেছে লেফটিস্ট পলিটিক্স তার সেই মুকুটের আর একটি পালক ছাড়া কিছু নয়।

আদর্শবোধ নীতিবোধ ব্যাপারগুলি মণিদীপা চরিত্রে বিন্দুমাত্র নেই। স্বামী মিঃ বোসকে সর্বশান্ত করে পথে বসানোই যার লক্ষ্য যে বলেছে ''যে কোনও গরিবেরই অধিকার আছে আমাকে ঘৃণা করার কারণ দুর্ভাগ্যবশত আমি একজন ওপরওলার স্ত্রী। কিন্তু যে কোনও গরিবই আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্র।''[৭৩] সেই মণিদীপার মাসিক হাত খরচ যখন চার হাজারে বেঁধে দিয়েছে মিঃ বোস তখন অর্থের স্বল্পতায় মণিদীপা ছটপট করেছে। কাণ্ডজ্ঞানহীন মণিদীপা স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর অফিসে হানা দিয়েছে অর্থের প্রয়োজনে। দীপনাথকে সে জানিয়েছে ''হাতে টাকা নেই। মিস্টার বোসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যে এত ফাঁকা তা জানতাম না। ... পাঁচশ হলেই চলবে। অ্যারেঞ্জ করা যাবে অফিস থেকে।''[৭৪] আর দীপনাথ হিসাব করে দেখেছে ''বোস সাহেব দিল্লি যাওয়ার পর মনিদীপা কম করেও তিন হাজার টাকা তুলেছে। মাত্র দু-তিন দিনে।''[৭৫] মণিদীপার এই অবিমৃষকারী আচরেণর কোন জবাব হয় না।

মণিদীপার অপর এক অবিমৃশ্যকারিতার পরিচয় আমরা পাই তার ব্যবসা করার চিন্তাভাবনা থেকে। অপরকে অনুসরণ করে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করার ইচ্ছা এবং তার জন্যে সোনার গয়না বিক্রি করার মরিয়া চেষ্টা আমাদের কাছে কিছুটা হাস্যকর লেগেছে। কারণ এর আগে মনিদীপা নিজেই জানিয়েছে ''এর চেয়ে চাকরি করলে কি সুখী হওয়া যেত? বোধ হয় না। মণিদীপা ওই বাঁধা দশটা পাঁচটার কাজ করতে পারত না কিছুতেই।''[৭৬] আসলে কোনরকম গঠমূলক কাজ করা মণিদীপার পক্ষে সম্ভব নয়। এ সংবাদ পাঠককূল মণিদীপার চরিত্র থেকে আগেই বুঝে নিয়েছে। মণিদীপা নিজেও যে জানে না তা নয়। তাই ভাতের থালার সামনে দাঁড়িয়ে মণিদীপা ভাবে এই ভাতের জন্য তাকে কোন দিন কষ্ট পেতে হবে না তো। তবুও নিজের অস্তিত্বকে জাহির করতে ব্যস্ত মণিদীপা কিছু না কিছু করে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে। কিছুদিন পর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে তার সমস্ত প্রয়াস।

অপরদিকে দীপনাথের সঙ্গে প্রায় সাক্ষাতের মুহূর্ত থেকেই মণিদীপার এক অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠার আভাস পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে এই সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এইভাবে লেখক মণিদীপা চরিত্রকে এমন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছেন যেখানে থেকে চরিত্রকে কি পরিণতি

দেবেন সে বিষয়ে লেখক নিজেও দ্বিধাণিত ছিলেন। তাই মহুয়া চরিত্রকে এনে মিঃ বোস চরিত্রের নৈতিক স্খলন ঘটিয়ে মণিদীপার সঙ্গে তার মিলনের রাস্তা লেখক উন্মুক্ত রেখেছেন। এক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছে উপন্যাসে দীপনাথের উপস্থিতি। কিন্তু মিঃ বোসের কাজিন মুহূয়ার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের প্রসঙ্গ উপন্যাসের মূল কাহিনির সঙ্গে সাবলীলভাবে আসেনি। মণিদীপার উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, অযৌক্তিক পদক্ষেপ ও দীপনাথের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের পিছনে একটা যুক্তিপূর্ণ প্রেক্ষাপট দর্শানোর উদ্দেশ্য লেখক এ চরিত্র নিয়ে এলেও তা খুব বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

(ঙ) 'পার্থিব'

স্বদেশিকতার প্রেক্ষিতে আধুনিক সভ্যতার দ্বন্দ্বদীর্ণ চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পার্থিব উপন্যাস আসলে একালের মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে। এক ডজন কাহিনি আর উপকাহিনির বিপুল বিস্তৃতির মধ্যে অসংখ্য নারী চরিত্রেরও আগমন ঘটেছে। এই উপন্যাসের নারীরা সকলেই প্রায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে এসেছে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণির মহিলারা একেবারে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। যাদের মধ্যে আছেন নয়নতারা, বীণাপাণি, শ্যামলী ও রাঙার মতো নারীরা। আর এক শ্রেণির নারীরা হল উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। এরা হল চারুশিলা, ঝুমকি, রিয়া, অপর্ণা, অনু, আপ্পা, রেশ্মি প্রমুখ।

পার্থিব উপন্যাস আসলে কৃষ্ণজীবন নামে একজন জ্ঞানী মানুষের বিশ্ববীক্ষার কাহিনি বর্ণন। তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে বহু চরিত্র বা কাহিনি বা তাকে পূর্ণতা দিতেই উপন্যাসে সমাগম ঘটেছে বহুচরিত্র বা কাহিনির। তাই এখানে নারী চরিত্রগুলি বিশেষ কোন স্বকীয় উজ্জ্বলতার দাবি রাখে না। উপন্যাসে কৃষ্ণজীবনের মা নয়নতারার মধ্যে লেখক প্রত্যক্ষ করেছেন শাশ্বত সেই ভারতীয় নারীকে। যে ধাত্রীরূপে সংসারকে ধারণ করে। দেশবিভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষের সব হারানোর হৃদয়বেদনাকে বুকে লুকিয়ে রেখে, অসহয়নীয় দারিদ্রতার সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে লড়াই করেও অষ্টাদর্শ শতাব্দীর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের মতো সে নারীর যেন একমাত্র কামনা 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে'। বাইরের জগতের লোভনীয় ভোগ্যপণ্যের বিপুল সমাহার প্রতিনিয়ত তাকে লালায়িত করে প্রতারণার স্বীকার করতে পারে না। সংসারের ছোট গণ্ডি ও বিষ্ণুপদর মত সৎ বিবেচক স্বামী এতেই সন্তুষ্ট সে।

কিন্তু তার পুত্রবধূ বা মেয়ে কেউই তার মতো স্বল্পে সন্তুষ্ট নয়। তারা কমবেশি লোভ, লালসা, মাৎসর্যের দ্বারা প্রতারিত। প্রতারিত পুত্রবধূ, কন্যার যন্ত্রণা দগ্ধ করেছে নয়নতারাকেও। কন্যা

বীণাপাণিকে বিষ্ণুপদ পাত্রস্থ করেছিলেন নিমাইয়ের চরিত্রের সততার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি আধুনিক যুগে সততার দাম আসলে অচল পয়সার মতোই। তাই সংসার চালানোয় অক্ষম নিমাইয়ের ডুবন্ত সংসার-তরণীর মূল কাণ্ডারী হতে হয় বীণাপাণিকেই। পয়সা উপার্জনের জন্য যাত্রা দলে নাম লেখায় বীণাপাণি। যাত্রার মঞ্চের উজ্জ্বল আলোর উপস্থিতিতে দর্শকের সামনে নিজেকে মেলে ধরতে গিয়ে ধীরে ধীরে বীণাপাণির জন্মান্তর ঘটে যায়। গ্রাম্য নারীর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা উচ্চাকাঙ্ক্ষী নটী বীণাপাণি। তাই অবলীলায় সে পিতা বিষ্ণুপদর কাছে স্বীকার করে যে ''কলি যুগে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোন ধর্ম আছে বলো! ধর্ম ধুয়ে কি জল খাবো। ... ধর্ম ধরে বসে থাকলে কোথায় তলিয়ে যেতাম তার ঠিক নেই।''[৭৭] নিম্নমধ্যবিত্তের প্রতিদিনের গ্লানিময় জীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে উচ্চমধ্যবিত্তের ঝাচকচকে সব পেয়েছিল স্বপ্নময় জীবন যখন তাকে আকৃষ্ট করেছে, বীণাপাণি চরিত্রের এই পরিবর্তনের লগ্নেই ঘটনাচক্রে কিছু অবৈধ ডলার এসে পৌঁছে তার হাতে। বীণাপাণি যেন তার হাতের মধ্যে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ পেয়ে গেছে। অবৈধভাবে প্রাপ্ত বিপজ্জনক এই ডলার যা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে তাকে সে কোন মূল্যেই হাতছাড়া করতে রাজি নয়। এখানেই নৈতিকতার প্রশ্নে তার বিরোধ বেঁধেছে স্বামী নিমাইয়ের সঙ্গে। সে নিমাইয়ের ঘর ছেড়ে একাকী জীবনযাপন শুরু করেছে। পরবর্তীকালে এই কারণে বাবা বিষ্ণুপদর সঙ্গে তার মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। নিমাই অবশ্য ডলারের কারণে বীণাপাণির জীবনে আগত অবাঞ্ছিত বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করেছে এবং কৃষ্ণজীবনের হস্তক্ষেপে বীণাপাণি নিমাইয়ের জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে। নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে তারা এক সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন লাভ করেছে।

বীণাপাণির দুই ভ্রাতৃবধূ শ্যামলী ও রাঙা তাদের নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার গণ্ডির মধ্যে সন্তুষ্ট নয়। বামাচরণের স্ত্রী শ্যামলীর মধ্যে তীব্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রায় বিকৃতির পর্যায়ে পৌঁছেছে। তার প্ররোচনায় বামাচরণ পিতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে পিছপা হয়নি। ভাই রামজীবন এবং বাবা সম্পর্কে 'রাজ'কে সে বলে ; ''এই শালা বুড়োর জন্যই যত গণ্ডগোল বুঝলেননি রাজুদাদা? কবে থেকে বলে আসছি বাবা, বাড়িটা ভাগজোখ করে বেড়া তুলে দাও। শালা বসে বসে ঝিমোয় আর কাঁড়ি কাঁড়ি খায়। গা করে না। কেন করে না জানেন? ওই হারামজাদা রেমো ওকে হাত করেছে। রামজীবন ছাড়া উনি চোখে অন্ধকার দেখেন।''[৭৮] ভালোভাবে বাঁচার, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের স্বপ্ন রাঙার মধ্যে থাকলেও শ্যামলীর মতো এতটা নৈতিক অধঃপতন তার ঘটেনি। শ্বশুর, শাশুড়ি সেবা, যত্ন, তাদের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য সবটাই রাঙা একলাই পালন করেছে। অবশ্য এর পিছনে প্রধান কারণ ছিল রামজীবনের অত্যধিক পিতৃভক্তি। স্বার্থপরতা লোভ লালসায় দীর্ণ পৃথিবীতে শ্যামলী-

রামজীবনের পিতৃভক্তি, দায়িত্ববোধ আমাদেরকে অন্ধকারে আশার আলো দেখায়।

এই উপন্যাসে চারুশিলা, রিয়া, অপর্ণা, রেশ্মি, ঝুমকি এরা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণির বেশিরভাগ মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, ভাবপ্রবণতা ও সংকীর্ণ স্বার্থপরতাই হল সাধারণ চারিত্রিক লক্ষণ। ভাবপ্রবণতার কারণেই এদেশের বেশিরভাগ উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলা জগৎ জীবনকে তার সত্য স্বরূপে দেখতে ব্যর্থ। অলীক স্বপ্নমোহ অবাস্তব ক্রিয়াকাণ্ডে আস্থা তারই ফল। সকল বিপদ আপদ থেকে নিজেদের বাঁচাবার সযত্ন প্রয়াসে ক্ষুদ্র স্বার্থ কেন্দ্রিক স্বকীয় বিশ্ব সৃষ্টি করে এরা আত্মরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত। একদিকে নিম্নশ্রেণির মানুষের প্রতি অবজ্ঞা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ভদ্রতা ও রুচির দেয়াল তৈরি করে কায়িক শ্রম নির্ভর মানুষদের থেকে নিজেদের আলাদা রাখার আপ্রাণ চেষ্টা অন্যদিকে বিত্তবান শ্রেণিতে যে কোন উপায়ে অনুপ্রবেশের আকুলতা এদের মজ্জাগত।

উপন্যাসে উচ্চমধ্যবিত্ত নারী চারুশীলা মননের গভীরতাহীন ভোগবাদী চরিত্র। আর্কিটেক্ট স্বামী সুব্রতর উপার্জিত অর্থের প্রভাব ঘাটিয়ে সে তার আশেপাশের মানুষজনদের নিয়ে একটা ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি করেছে। যার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছে সে নিজে। অর্থের প্রাচুর্য তার চারপাশে এমন এক অদৃশ্য দেওয়াল রচনা করেছে যে জীবনের বাস্তবতা তার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। তাই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এই মহিলা হেমাঙ্গ, ঝুমকি ও রেশ্মির ত্রিকোণ সম্পর্কের মধ্যে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে অকারণ জটিলতার সৃষ্টি করেছে। আবার কারণে অকারণে হাজার হাজার টাকার অপব্যয় করতে উদ্যত নারী চারুশীলা সহজেই ভাই হেমাঙ্গকে বলে আমার সামনে গরিব কথাটা উচ্চারণ করবি না কখনও। গরিব কথাটাই আমি সহ্য করতে পারি না। গরিবদের দু-চোখে দেখতেও পারি না।"[৭৯]

উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণজীবনের উচ্চশিক্ষিতা অধ্যাপিকা স্ত্রী রিয়া কৃষ্ণজীবনকে তার মূল থেকে ছিন্ন করে নিয়ে ফ্ল্যাট কেন্দ্রিক নগর জীবনে আবদ্ধ হতে বাধ্য করছে। কারণ কৃষ্ণজীবনের অশিক্ষিত ভাই, বোন, গ্রাম্যজীবনে অভ্যস্ত বাবা মাকে রিয়া কোনদিন মন থেকে স্বীকার করে নিতে পারেনি। উচ্চমধ্যবিত্ত সুলভ অহমিকা রিয়ার মধ্যে জন্ম দিয়েছে যে সংকীর্ণতা তারই ফলশ্রুতি রয়েছে রিয়ার এই আচরণে। তাই বিজ্ঞানী কৃষ্ণজীবন অনুজদের প্রতি কর্তব্য করতে না পারায় ক্লিষ্ট হলেও সেই বেদনার শরিক হতে পারেনি রিয়া। ভাবজগতে স্ত্রীর কাছে থেকে অনেকটা বিচ্যুত কৃষ্ণজীবন বাবার মৃত্যুতে যেন বুঝে গেলেন "ভাত কাপড়ের চেয়েও অনেক বেশি অভাব এখন এই মাহার্ঘ ভালবাসার। ওই এক জায়গায় মানুষ এখন দেউলিয়া। এখন মানুষের ভালোবাসার লগ্নি বড্ড ছোট। বউ আর বাচ্চাকে নিয়ে ছোট ফ্রেমে ভালবাসাকে বাঁধিয়ে নিয়েছে সে।"[৮০]

উপন্যাসে বেসরকারি সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মচারী মনীশের স্ত্রী অপর্ণা মনীশ অসুস্থ হবার পর গভীর চিন্তায় মগ্ন ''মনীশ কি চলল? মনীশ চলে গেলে অপর্ণার কি করে চলবে?''[৮১] তার আরও চিন্তা ''কিন্তু মনীশ যদি না ফেরে? মনীশ না ফিরলে তার পিছনে চালচিত্রের মতো বহুজাতিক সংস্থাটিও মুছে যাবে। এককালীন কিছু টাকা গছিয়ে দিয়ে কোম্পানি তাদের সম্পূর্ণ ভুলে যাবে। আর তখনই কি শুরু হবে টাকার প্রতিশোধ?''[৮২] অপর্ণার এই ভবিষ্যৎ চিন্তা মধ্যবিত্ত সুলভ হীনস্বার্থপরতার চরম নিদর্শন। মনীশ সুস্থ হলে সে আবার মনীশের কোম্পানির দেওয়া ফ্লাটের ভরসা ছেড়ে বাড়ি নির্মাণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মনীশের অবর্তমানে কোম্পানি যেখান থেকে তাদের বিতাড়িত করতে পারবে না। চিন্তাবিলাসী মধ্যবিত্ত এই নারী এক কাপ চা বাড়তি হলে যেমন চিন্তামগ্ন হয়ে ওঠে তেমনি আবার কন্যা ঝুমকির সর্দিকাশিতেও বিপন্ন বোধ করে। স্বামী সন্তান নিয়ে বাঁধানো ফ্রেমে জীবনকে সাজিয়ে তুলত অভ্যস্ত এইসব মধ্যবিত্ত নারীর কাছে বাইরের জগতের কোন ঘটনাই কোন অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারে না।

উপন্যাসে বিদেশে শিক্ষা প্রাপ্ত নারী রেশ্মির আচরণ ও গড়পড়তা বাঙালি শিক্ষিতা মহিলাদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে থাকার মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। কোলকাতা নয় তার স্বপ্নের শহর লন্ডন। আর এই লন্ডনে বসবাসের স্বপ্নকে সত্য করতে সে অবলীলায় হেমাঙ্গর সঙ্গে প্রেম সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েও তার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এবং লন্ডন গিয়ে নতুন পুরুষের সঙ্গে নতুনভাবে ঘর বাঁধতে তার কোন অসুবিধা হয় না। বিংশ শতাব্দীর এই নারী যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আধুনিক উচ্চশিক্ষিত মেয়েদের নিজের দেশ নিজের জায়গায় প্রতি স্পর্শকাতরতার কোন জায়গা নেই। বিদেশের স্বপ্নময় জীবনের জন্য এমনকি তারা প্রেমকেও প্রত্যাখ্যান করতে পারে। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ঐশ্বর্যের জন্য বাকি সব কিছু তাদের কাছে ছোট প্রতিপন্ন হয়। ভোগবাদের এ এক চরম নিদর্শন। এইভাবে সমগ্র উপন্যাসে উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণির প্রতিনিধি মহিলারা তাদের বিচিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তার থেকে বাঙালি সমাজে সমগ্র উচ্চমধ্যবিত্ত নারী সমাজকে বুঝে নিতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না।

(চ) 'চক্র'

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের জগতে শীর্ষেন্দুর আবির্ভাবে ক্ষনে যে সর্বনাশা অবক্ষয় বাঙালি সমাজকে গ্রাস করেছিল সমাজজীবনের সেই পটভূমিকে পুরুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা মাথাছাড়া দিলেও নারী স্বাতন্ত্রতাবাদের বিকাশ তখনও সম্ভবপর হয়নি। তাই সনাতনপন্থী ঠাকুর

অনুকূল চন্দ্রের অনুগামী শীর্ষেন্দু তাঁর উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত নারী চরিত্র চিত্রণে ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন। তাঁর চক্র উপন্যাসে একদিকে আছে বলাকা, পারুল, বকুল, সন্ধ্যার মতো চিরন্তন বাঙালি নারীর শাশ্বত মহিমায় উপস্থিতি অপর দিকে আছে অমলের স্ত্রী মনার মতো আধুনিক মনস্ক, স্বাধীনচেতা নারী। নারীচরিত্রের এই দুই বৈপরীত্যের মধ্যে সেতুবন্ধনকারী চরিত্র হল সোহাগ ও পান্না।

বলাকা — ঠাকুর শ্রীশ্রী অনুকূল চন্দ্রের মন্ত্র শিষ্য শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে নারীচরিত্র ভাবনায় ঠাকুর কথিত আদর্শকেই অঙ্গিকার করে নিয়েছেন। তারই সহজ পরিচয় বহন করে 'চক্র' উপন্যাসে তাঁর সৃষ্ট বলাকা চরিত্র। এর পূর্বে 'দূরবীন' (১৯৮৬) উপন্যাসের রঙ্গময়ী ও রেমি নারী চরিত্র দুটিতে আদর্শ বাঙালি মধ্যবিত্ত নারী সম্পর্কিত লেখকের চিন্তাধারার প্রতিফলন লক্ষ করি। আর 'চক্র' (২০০৫) উপন্যাসের বলাকা যেন লেখকের সেই ভাবনারই মূর্ত প্রতীক। ১০ বছর বয়সের বলাকার বিবাহ হয় ২৫ বছর বয়স্ক গৌরহরির চট্টোপাধ্যায়ের সাথে। বয়সের এই বিরাট ব্যবধান আজকের যুগের মেয়েদের কাছে গল্পকথার মতো। পিতা ও পতি যেহেতু একই ধাতু নিষ্পতি শব্দ তাই উভয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নারীমনে শ্রদ্ধাভাব সদাজাগ্রত থাকা সমীচীন বলে ঠাকুরের মতো হয়তো বা লেখক নিজেও বিশ্বাস করতেন। স্বামীর প্রতি বন্ধুত্ব, সহানুভূতিশীল মানসিকতা নয়, শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের মানসিকতাই বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে সুখী দাম্পত্য জীবনের মূল চাবিকাঠি। বাবা মার কাছ থেকে দূরে অবস্থান করে, বলাকা শিশু থেকে কিশোরী, কিশোরী থেকে যুবতীতে উত্তীর্ণ হয়েছে স্বামী গৌরহরির ছত্রচ্ছায়ায় ধীর, স্থিতধী, ব্যক্তিত্বশালী এই পুরুষ তার রমণীটিকে যথার্থভাবেই স্ত্রীরত্নে পরিণত করেছিলেন। বলাকা চরিত্রের মূল নির্মাতা তাঁর স্বামী। পিঞ্জরবদ্ধতা নয় উন্মুক্ত আকাশে পাখা মেলে দেবার মধ্যেই বলাকারা তৃপ্ত আনন্দিত হয়। কিন্তু ভালোবাসার পিঞ্জরে বদ্ধ নারী বলাকা সংসার জীবনের ঘেরাটোপের মধ্যেই সুখী সম্পৃক্ত। স্বামীর প্রতি সশ্রদ্ধ ভালোবাসা, সংসারের প্রতি মমত্ববোধ বলাকার মধ্যে আত্মসম্মানবোধ, স্বাধীন মতামত এই সংক্রান্ত প্রশ্নকে তার মনে স্থান দেয়নি। সে শুধু জানে "ও মানুষটা (গৌরহরি) আমার শ্বাসবায়ুর মতো, বুকে ধুকপুকুনির মতো। সে ছাড়া নিজেকে ভাবতেই পারতাম না।"[৮৩] পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বলাকার কাছে স্বামী গৌরহরির সিদ্ধান্তই সর্বাগ্রে শিরোধার্য হয়েছে। এইভাবে সারা উপন্যাসে স্বামী (দেবতা) বলাকার হৃদয়ে অন্তরআত্মা রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

তবে আদর্শ বাঙালি মধ্যবিত্ত নারী সম্পর্কিত লেখকের ভাব ভাবনার বাহক হতে গিয়ে চরিত্রটি অনেক ক্ষেত্রে পুরোপুরি রক্ত মানসের মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। গৌরহরির মৃত্যুর পর বলাকার সহমরণে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ, স্বামীর মৃত্যুর পর বৈরাগির জীবন অবলম্বন করা এবং দান

ধ্যানে অত্যধিক উৎসাহি হয়ে বস্তুগত মায়া মোহ ত্যাগের বাসনা চরিত্রটিকে বাস্তবচ্যুত ও কাল্পনিকতার দোষে দুষ্ট করেছে। যে কোন চরিত্র পরিকল্পনায় কমবেশি কাল্পনিকতার আশ্রয় লেখক নিয়ে থাকেন, তা সর্বজন স্বীকৃত সত্য। কিন্তু চরিত্র যদি লেখকের কল্পনার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তাহলে সমগ্র চরিত্রটিই কাল্পনিক চরিত্র হয়ে যায় পাঠকের কাছে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সৃষ্ট বলাকা চরিত্রটি সেই দোষে দুষ্ট বলে আমার মনে হয়। একবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে এরকম একনিষ্ঠ পতিব্রতা নারীর স্বাক্ষাৎ আমরা লেখকের কল্পনাতেই পাই বাস্তবে নয়।

পারুল — গৌরহরি বলাকার কন্যা পারুল উপন্যাসের অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র। পিতার প্রবল ব্যক্তিত্ব পরায়ণতা এবং মাতার বাঙালি নারীসুলভ নিষ্ঠা, সহনশীলতা, ঐতিহ্যের অনুসরণ প্রভৃতি গুণাবলী পারুল চরিত্রের ভিত্তি রচনা করেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যের 'মানস সুন্দরী' কবিতায় বলেছেন আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে গড়ে তুলি মানসপ্রতিমা। এই মানসকন্যার সাথেই রোমান্টিক কবির নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন। আর কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য জীবন পরিক্রমায় তাঁর সৃষ্ট 'চক্র' উপন্যাসের পারুল চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর মানসকন্যাকে যেন খুঁজে পেয়েছেন। তবে পারুল লেখকের রোমান্টিক যাত্রার কাণ্ডারী নয়। পারুলের মধ্যে লেখকের 'আমার আমি'কে খুঁজে পাবার কোন আকাঙ্ক্ষাও নেই। পারুল আসলে আদর্শ মধ্যবিত্ত নারীর 'মডেল' চরিত্র। সে জানে কীরকমভাবে সংসারকে সুখী রাখতে হয় এবং নিজে সুখী হতে হয়।

কিশোরী পারুল প্রেমে পড়ে গ্রামেরই মেধার বিচারে 'Topper' যুবক অমলের। একদিকে মেধাবী পুরুষ অমল অন্যদিকে ডাকের সুন্দরী নারী পারুল ফলে তাদের প্রেমকাহিনির শাখা প্রশাখা বিস্তার করতে বিশেষ সময় লাগেনি। সবকিছুই যখন স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলছিল তখন অমলের এক অবিমৃষকারী আচরণ উপন্যাসের প্লটের গতিমুখ পরিবর্তন করে, পরিবর্তিত হয়ে যায় পারুল জীবনের গতিমুখও। কামুক অমল দ্বারা ধর্ষিতা পারুলের মনে অমল সম্পর্কে এই প্রশ্নই বড় হয়ে ওঠে ''তুমি যদি আমাকে ভালই বাসো তাহলে রেপ করো কী করে? এরকম কি কেউ করে?''[৮৪] এই মৌলিক প্রশ্নই পারুলকে অমলের থেকে কয়েক যোজন দূরে স্থাপন করে। পারুল পরিষ্কার ভাষায় অমলকে জানিয়ে দেয় তোমার সংযম নেই, তুমি বেহাল হয়ে যাও, মেয়েরা তাদের পুরুষকে ওরকম দেখতে ভালোবাসা।''[৮৫] এই ভালোবাসার চরম পরিণতিতে পারুল অমলকে প্রত্যাখ্যান করে জ্যোর্তিময় গাঙ্গুলি নামে এক সৎ চরিত্রবান পুরুষকে বিবাহ করে। পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে নারীর এই নীরব অথচ সক্রিয় প্রতিবাদ বাঙালি মধ্যবিত্ত নারীদের এক নতুন দিশায় সন্ধান দেয়। পারুল কেবল আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, দৃঢ়চেতা নারীই নয় সে সত্যবাদী এবং

অকপট। তাই কোন ছলনার আশ্রয় না দিয়ে দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই সে তার ''ভিতরে চেপে রাখা গোপন কথার কীটদংশন সইতে না পেরে সে তার স্বামী জ্যোতিপ্রকাশ-কে সবই বলে দিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, সব প্রকাশ না করলে জ্যোতিপ্রকাশের সঙ্গে তার জীবনটা সম্পূর্ণ হবে না। খাদ থেকে যাবে। ভারমুক্ত হতে পারবে না সে।''[৮৬] অপরদিকে যে যুবাপুরুষকে নিয়ে সে তার সুখের সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল সেই বিশেষ যুবাপুরুষটি তার কাছে নির্বিশেষ হয়ে যায়। নারীসুলভ সহজ আবেগ নয়, বুদ্ধিমত্তা হিতাহিত জ্ঞানের প্রখরতা পারুল চরিত্রের আচরণকে দৃঢ়তার নিয়ন্ত্রণ করেছে।

বিবাহিত জীবনে স্বামীর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহতেই পারুলের সামনে পেশাগতজীবনের দরজাও উন্মুক্ত হয়ে যায়। সে কেবল তার স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী না হয়ে কর্মজীবনেও স্বামীর সহযোগী, সহকারী হয়ে যথার্থই জীবনসঙ্গিনী হয়ে উঠেছে। একদিকে সহজাত গুণাবলীর সাহায্যে সে জ্যোতিপ্রকাশের সংসারকে সুখী সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে। অপরদিকে নিদারুণ দক্ষতায় সে তার স্বামীর ব্যবসাকে ক্রমবর্ধনশীল করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে ভোগবাদের ব্যাপক প্রসার, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন প্রভৃতির হাত ধরে বাঙালি সমাজে নারীদেরও পেশার জগতে অনুপ্রবেশের প্রতি ব্যক্তি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নৈতিক সমর্থন ছিল না। উপন্যাসিকের এই ব্যক্তিগত ভাবনা সঞ্চারিত হয়েছে তাঁরই আদর্শায়িত চরিত্র পারুলের মধ্যে। তাই পেশার কারণে সন্তানদের যথাচিত দেখভাল করতে না পারার জন্য পারুলের মধ্যে আছে গভীর অনুশোচনাবোধ। এখানেই 'মানব জমিন' উপন্যাসে 'বিলু'র থেকে পারুল ঔপন্যাসিকের ভাবনার জগতে অন্য সাড়িতে নিজের স্থান করে নেয়। বিলুর কাছে পেশাগত জীবন ছিল নিছকই 'প্যাশন'। স্বামী, সন্তানের জন্য ভাবনা তার কাছে সেভাবে গুরুত্ব পায়নি। স্বামীর সহযোগী হতে গিয়ে স্বামী সন্তানের প্রতি পারুলের বিচ্ছিন্নতা বোধ বৈষ্ণব শাস্ত্রের ''দুহু ক্রোড়ে দুহু কাঁন্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া''র কথাই আমাদের স্মরণ করিয়া দেয়।

শুধুমাত্র সন্তানদের প্রতি কর্তব্যহীনতাজনিত যন্ত্রণাই নয় অর্থের প্রাচুর্য ধীরে ধীরে পারুলের মনে অর্থের অনর্থক দিকটাইকেও জাগিয়ে তুলেছে। তাই পারুলের মনে হয়েছে 'বেশি টাকা রোজগার করারও একটা একঘেয়েমি আছে। মনে হয় দূর ছাই এত টাকা দিয়ে কী হবে?''[৮৭] তার আরও প্রশ্ন ''আমি যদি পাঁচশোটা বেনারসি কি বমকাই কিনি, হাজার ভরি গয়না গড়াই, দশটা গাড়ি এনে গ্যারেজে ভরি বা দশটা বাড়ি তৈরি করি— কিছু লাভ হবে তাতে? ক্লান্তি লাগবে না?''[৮৮] এই বিস্ময়কর ক্লান্তিবোধ সাধারণত মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের মেয়েদের থাকে না, থাকার কথাও নয়। পারুল চরিত্রের মধ্যে এই বোধ সঞ্চারিত হয়েছে গৌরহরি চট্টোপাধ্যায় ও মা বলাকার কাছ থেকে।

যোগ্য সন্তানের জন্য পিতামাতার যথাযোগ্য অবদানকে লেখক এ উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টি ও কাহিনি বিন্যাসের কৌশলের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। অমলকন্যা সোহাগের কাছে পারুল হল 'গডেস'। সারা উপন্যাস বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি উপন্যাসে সারাক্ষণ লেখক পারুলের এই 'গডেস' 'ইমেজ' অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। যদিও উপন্যাসে কোথাও পারুলকে আমাদের অবাস্তব, অ-পার্থিব চরিত্র বলে মনে হয়নি। সে একান্তই আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের ঘরের মেয়ে বলেই প্রতিভাত হয়েছে।

সন্ধ্যা — উপন্যাসে অমলের বোন সন্ধ্যা আর বাসন্তী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সৃষ্টি অদ্ভুত দুই নারী চরিত্র। 'পতি পরম গুরু' এই আপ্তবাক্যই যেন এই নারীদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে। যদিও স্ত্রী হিসাবে স্বামীর কাছে দুই নারীর অবস্থা খুব একটা সম্মানজনক ছিল না। সাধারণ গ্রাম্য অল্পশিক্ষিত সন্ধ্যার বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। সন্ধ্যার বাবা মহিম চৌধুরীর ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে তাকে প্রতারিত করে পাত্রপক্ষ। প্রচুর টাকা পণ নিয়ে বিবাহ করার পর সন্ধ্যার স্বামী সন্ধ্যাকে পরিত্যাগ করে এক অভিনব পদ্ধতিতে। কোনরকম অত্যাচার, শাসন নয় অনুনয়বিনয় করে সে সন্ধ্যার কাছ থেকে মুক্তি কামনা করে। অর্থাৎ সন্ধ্যাকে নিজের জীবন থেকে সরিয়ে রাখার জন্য অভিনব কৌশলের আশ্রয় নেয় সন্ধ্যার স্বামী। এখানেই সন্ধ্যার দাম্পত্যজীবনের ইতি টানা হয়ে যায়। সন্ধ্যার স্বামীর এই অদ্ভুত আচরণে আমরা যত না অবাক হই তার থেকেও বেশি একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত নারী সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ আমরা হতবাক হয়ে যাই বিবাহবিচ্ছিন্না নারী সন্ধ্যায় স্বামীর প্রতি সহানুভূতিশীল মানসিকতা দেখে। প্রাচুর্য নয়, আধিপত্য নয় একমাত্র স্বামীসন্তান নিয়ে একটা সুখীসংসারের যে স্বপ্ন সন্ধ্যা ছোট থেকে মনে লালন করে আসছে সেই স্বপ্ন যখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে তখন নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে সন্ধ্যার অবলম্বন হয়েছে আচারের ব্যাবসা। আবার তার ব্যবসায় অর্জিত অর্থ সে তার স্বামীর দ্বিতীয়বারের সংসারে দান করতেও প্রস্তুত কেবলমাত্র স্বামীর মুখ চেয়ে।

এরকম অবান্তর স্বামিপ্রেমের ব্যাখ্যা আমরা পাই তারই উক্তি থেকে ''সমাজের নিয়ম কি সব সময়ে সকলের ক্ষেত্রে খাটে? মানুষের মনের ভিতরটায় কত কী আছে, বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না।''[৮৯] আবার স্বামীর দেওয়া শাখা সিঁদুরের কথা ভেবে তার দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে মন থেকে সায় পায় না। আমি যে হিদুমতে সধবা বরতো দিব্যি বেঁচে বর্তে আছে।''[৯০] অথচ তার স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করে সানন্দে মুখে সংসার করার খবরে অবিচলিত সন্ধ্যা সারা জীবন ধরে স্বামী তাকে পরিত্যাগ করলো কেন তার কারণ নিজের মধ্যেই খুজে বেরিয়েছে। যদি তুখোড় বুদ্ধি থাকত তাহলে হয়তো সেই লোকটা অমন তাড়িয়ে দিতে সাহস পেত না।''[৯১] স্বামীকে অভিযুক্ত

করার ভাবনা তার মধ্যে একবারও দানা বাঁধেনি। প্রকৃতপক্ষে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মাতৃরূপী, জননীরূপী নারীকে চিত্রিত করতে বেশি আগ্রহী। তাই সহনশীলতা, সহানুভূতিশীলতা তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়েছে। সন্ধ্যা চরিত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বাসন্তী — ঠাকুর শ্রী শ্রী অনুকূল চন্দ্র তাঁর নারীর নীতি গ্রন্থে 'পতিপ্রেমের কষ্টি পাথর' শীর্ষক পদে বলেছেন ''সপত্নী প্রেমই/স্বামী-প্রেমের সাধারণত উজ্জ্বল স্বাক্ষ্য/নিশ্চয় জানিও।''[৯২] ঠাকুরের এই বাণীকে পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দেবার অঙ্গিকার নিয়েই যেন ঔপন্যাসিক 'চক্র' উপন্যাসে রসিক বাঙালের দ্বিতীয় স্ত্রী বাসন্তী চরিত্রের অবতারণা করেছেন। শুধুমাত্র বিষয় সম্পত্তি দেখভাল করার প্রয়োজন রসিক বাঙাল কলকাতায় স্ত্রী-সন্তান নিয়ে পরিপূর্ণ একটা সংসার থাকা সত্ত্বেও বর্ধমানের গ্রামে এসে দ্ররিদ্র কন্যা বাসন্তীকে বিবাহ করে। কোন শারীরিক প্রয়োজন বা হৃদয়ঘটিত কারণে নয়। বৈষয়িক প্রয়োজনে বাঙালের দ্বিতীয় স্ত্রী হওয়া বাসন্তী আর সব ভুলে পরিপূর্ণভাবে রসিক বাঙালের ঘরণী হয়ে উঠেছে। মা জিজিবুড়ি ও দুই ভাইদের হাত থেকে স্বামীকে রক্ষা করতে বাসন্তী সদাসতর্ক থেকেছে। রসিক বাঙালের সন্তানের মা হয়ে তাঁর সংসারকে শ্রীময়ী করে তুলে গ্রামের মাটিতে রসিক বাঙালকে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সুপ্রশস্ত করেছে বাসন্তী। বাঙালের আগের পক্ষে স্ত্রী, সন্তানদের প্রতি ঈর্ষা নয় বাসন্তী মনে সদাই এক সমীহের ভাব গড়ে উঠেছে। উদারমনস্ক, স্নেহশীল স্বামীর প্রতি তার মনোভাব এরকম ''বড্ড ছেলেমানুষ তার এই মানুষটা। মানুষটার আধখানা সে পেয়েছে। তাইতেই ভরে গেছে বাসন্তীর পুরোটা যদি পেত! না থাক। ওসব ভাবতে নেই।''[৯৩] স্বামীর প্রতি এই অসীম শ্রদ্ধাশীলতা, স্বপ্নে সন্তুষ্ট হবার মানসিকতা সুখী বাঙালি দাম্পত্য জীবনের মূল চাবিকাঠি। কথায় বলে সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। বাসন্তীর মধ্যে সেরকমই সর্বগুণ সম্পন্ন রমণীর ছবি আঁকাই ঔপন্যাসিকের একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে হয় তানাহলে রসিক বাঙালের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও বাসন্তীর সংসারে উপচে পরাসুখের যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তা সম্ভবপর হত না।

মোনালিসা— যে দৃষ্টিকোণ থেকে ঔপন্যাসিক 'চক্র' উপন্যাসে বলাকা, পারুল, সন্ধ্যা বাসন্তীর মতো ঐতিহ্যর অনুসারী রক্ষণশীলা নারী চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন ঠিক তার বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টি করেছেন অমলের স্ত্রী মোনালিসার মতো আধুনিকা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুগত, প্রতিবাদে মুখর, অসহনশীল চরিত্র। দুই বিপরীত জীবনধারায় বিশ্বাসী নারীচরিত্রের পাশাপাশি অবস্থান উপন্যাসের প্লটকে সমৃদ্ধ করেছে। অমল মোনালিসার বিবাহের সাতদিনের মধ্যে মোনালিসা অমল পারুলের প্রেমের সম্পর্কে অবহিত হয়ে যায়। তখন থেকেই অমলের প্রতি বিষাক্ত হয়ে ওঠে

মোনালিসার মন। তার সহজাত শিক্ষা, পারিবারিক প্রেক্ষাপট সন্ধ্যা বা বাসন্তীর মতো স্বামীর কোন চারিত্রিক ত্রুটি মনে না রেখে তাকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে স্বেচ্ছাচারী স্বামীরই ভজনা করতে শেখায়নি। তাই অমল মোনালিসার দাম্পত্য সম্পর্ক শুরুতেই যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তার থেকে উত্তীর্ণ হবার কোন রাস্তা পায় না। মোনালিসার একমুখীন তিরস্কারপূর্ণ বাক্যবাণে জর্জরিত হয়েছে অমল। তাদের প্রেমহীন দাম্পত্যজীবন দিশাহীন তরুণীর মতো সংসার রূপ সমুদ্রে ভাসতে থাকে। সাধারণত নারীরাই সংসারের হাল ধরে রাখে। সেই নারী যদি কোন কারণে সংসারকেন্দ্রাতিক আকর্ষণ অনুভব না করে তবে হাল ছেঁড়া তরণীর মতোই সংসারের অবস্থা হয়। তাই ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নির্দেশিত পথেই লেখকও নারীর দক্ষতা, সহানুভূতি, সমবেদনার দ্বারা আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে পুরুষের বোধকে জাগ্রত করে তুষ্টি ও সন্তোষের সঙ্গে তাকে সঠিক পথের দিশা দেখবার পক্ষপাতি।

উপন্যাসে মোনালিসা চরিত্রের বিবর্তনও এসেছে লেখকের এই ভাবনার পথ ধরেই। সম্পর্কের শুরু থেকেই স্বামী অমলের প্রতি তীব্র বিরূপ মনোভাব থাকলেও ''আশ্চর্যের বিষয় হল, মেয়েদের সহজ সংস্কার বলে মোনার রাগ হওয়ার কথা পারুলের ওপর। কিন্তু অবাক কাণ্ড, সে কখনও পারুলের বিরুদ্ধে একটি কথাও, কখনও, বরং পারুলের ছবিখানা আলাদা করে সযত্নে আলবামের একটা আলাদা পৃষ্ঠায় সেঁটেছিল সেই। সে জানত, মাঝে মাঝে অমল ছবিটা খুলে দেখে। ধরা পড়লে সংকোচ বোধ করত অমল। কিন্তু মোনা বলত, দেখ, দেখ, ওই ছবি দেখে তোমার বিবেক জাগ্রত হোক।''[৯৪] সে পারুলকে প্রথম স্বাক্ষাৎকারে একথাও জানিয়েছে যে ''আপনার (পারুল) মধ্যে একটা অদ্ভুত গ্রেসফুলনেস আছে। এতদিন কেবল আপনার ছবি দেখেছি আর কথা শুনেছি। আজ মুখোমুখি দেখে আমারও মনে হচ্ছে আপনার মধ্যে ডিভাইন কিছু আছে।''[৯৫] পারুলের মধ্যে এই ডিভাইনত্ত্বের আবিষ্কার এবং অমলের গ্রামের বাড়িতে দীর্ঘ অবস্থানকালে অমলের পরিবারের গ্রাম্য সদস্য মোনালিসার ভাষায় যারা 'ভীষণ আনকালচার্ড' তাদের বিশেষ করে অমলের দাদা কমলের স্ত্রীর সান্নিধ্য মোনালিসার মধ্যে কমনীয়তা গুণের বিকাশ ঘটায়। তাই যে অতলান্ত অবিশ্বাসের পটভূমিতে তাদের দাম্পত্যসম্পর্ক দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে ধীরে ধীরে একটা বিশ্বাসের পটভূমিতে তাদের সম্পর্কপ্রতিস্থাপিত হবার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। দাম্পত্য সম্পর্কের এই নবীকরণের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে মোনালিসা নিজে। কন্যা সোহাগ মোনার মানসিকতার এই পরিবর্তন এবং অমল-মোনালিসার সম্পর্কের পুনর্জীবনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু অস্তিত্বের সন্ধানে বিপন্ন অমল তখন বাস্তবিক চাওয়া পাওয়া থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। পারুল বা মোনালিসার প্রেম নয় অমল তখন 'আমার আমি'র সন্ধানী। তাই মোনালিসার

এই প্রেমময়ী হয়ে ফিরে আসা অমলকে সেইভাবে স্পর্শ করেনি। সেই কারণে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের নতুন কোন রোমান্টিক মোড় নেবার ইঙ্গিত উপন্যাসে বর্ণিত হয়নি।

সোহাগ — অমল-মোনালিসার কন্যা সোহাগের মধ্যে প্রকৃতিপ্রেম, মাটির প্রতি একাত্মাবোধ, গ্রাম্যসংস্কৃতি ও গ্রামীণ মানুষের প্রতি তীব্র এক আকর্ষণের পাশাপাশি আধুনিক নাগরিক বৈদগ্ধ্যততা সুলভ নারী স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্ব, অপরাজেয় মানসিকতার এক অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে। অমল-মোনালিসার অ-সুখী দাম্পত্য জীবন সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছে স্পর্শকাতর সোহাগকে। বিদেশে আদিম জীবনযাপনে অভ্যস্ত 'TUPARI TRIPE' গ্রুপের দ্বারা অপহৃত সোহাগ 'Tri to fell the earth' এর যে প্রাথমিক পাঠ নিয়েছিল। পারিবারিক জীবনে স্নেহ ভালোবাসার আশ্রয়হীন সোহাগের কাছে প্রকৃতির স্নেহাঞ্চলই প্রধান আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। প্রকৃতির প্রতি একাত্মতাবোধ তার মধ্যে জন্ম দিয়েছে অদ্ভুত এক অনুভূতি প্রবণতা। অমলের গ্রামের বাড়িতে থাকার সময় প্রসঙ্গ ক্রমে সে অমলের পিতা মহিমকে জানিয়েছে ''আমার মনে হয় লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যেসব মানুষ মরে গেছে তাদের প্রত্যেকের একটা করে ইমপ্রেশন রয়ে গেছে অ্যাটমোসফিয়ারে। আই সি দেয়ার শ্যাডোজ, আই ফিল দেয়ার প্রেজেন্স। ... তারা তো আমাদের মতো নয়, তারা কেউ নেইও। কিন্তু তাদের ইমপ্রেশন, তাদের অনেক কথাবার্তা, অনেক সময় তাদের শ্বাসপ্রশ্বাসও টের পাই এবং মল্টিচুডস অব দেম।''[৯৬] অতিভৌতিকের অনুভূতি সোহাগকে নস্টালজিক করলেও বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত করেনি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মন, কলকাতার নাগরিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত, আধুনিক মনস্ক সোহাগ সরাসরি প্রতিবাদ করেছে বলাকার অন্ধ পতিভক্তিকে। বলাকার পতিভক্তির বাহুল্যতা শুনে সোহাগের প্রতিক্রিয়া ''সেটা কী করে সম্ভব? ইগো নেই? স্বাধীন মতামত নেই? ব্যক্তিত্ব থাকবে না। ... মাথা নেড়ে সোহাগ বলে না। আমি কখনও আপনার মতো হতে পারব না। আমি চিরক্যাল একজন আনহ্যাপি মেয়ে হয়ে থাকব।''[৯৭] সোহাগের কাছে হ্যাপিনেস মানে সেন্স অফ সিকিউরিটি নয়, নয় সেন্স অফ স্যাগরিফাইশ। সপ্তদশী এই বালিকা সুখ সম্পর্কে এক অদ্ভুত বিস্ময়কর প্রশ্ন উত্থাপিত করে বলাকার সাথে সাথে পাঠককূলকেও হতচকিত করে দেয়। তার মনে প্রশ্ন জাগে ''হ্যাপিনেস কি সবসময় ভাল? ... কেন যেন মনে হয় খুব হ্যাপি হওয়া ভাল নয়। ... তাতে মানুষের সার্চ কমে যায়, সে অলস হয়ে পড়ে, তার মন ঘুমিয়ে পড়ে।''[৯৮] যে মেয়ে এরকম পরিণত ভাবনার অধিকারী সে আত্মরক্ষার জন্য পুরুষের সাহায্য প্রার্থী হবে না এটাই স্বাভাবিক। গ্রামের 'ডাক সাইটের' ভালোছেলে বিজু বোন পান্নার অনুপ্রেরণায় বদ ছেলেদের হাত থেকে সোহাগকে প্রোটেকশান দিতে উদ্যোগী হলে সোহাগ জানিয়েছে ''কিন্তু সেটা তো সলিউশান নয়। আমাকে তো সব জায়গায় কেউ প্রোটেকশন দেবে না। আর প্রোটেকশান আমি চাই-ও না।

আমার খুব অপমান লেগেছে।"[৯৯] বিজুর সাথে সোহাগের এই মান অপমানের পালা মধুর পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। সাথে সাথে শহুরে 'আনহ্যাপি' সোহাগ সহজ গ্রামজীবনে, গ্রামীণ মানুষের মধ্যে জীবনের নতুন মাত্রা খুঁজে পেয়েছে।

পান্না — উপন্যাসে গ্রামের বুকে লালিত এই দুই নারী চরিত্র আয়ুর মাপকাঠিতে দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য সপ্তদশী পান্না মনেপ্রাণে রোমান্টিক। গ্রামের নরম মাটির মেয়ে পান্না মায়ের ভালোবাসার ভাগীদারকে বেশি সে না তার ভাই এই অবান্তর প্রশ্নে বিপর্যস্ত। মায়ের সামান্য শাসনে অভিমানী পান্নার অশ্রুসিক্ত হয়ে মৃত্যু ভাবনা এবং তার মৃত্যুর পরে মায়ের অভিব্যক্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ কল্পনা পান্না চরিত্রের কল্পনাবিলাসী রোমান্টিক মনেরই পরিচয় বহন করে। তার রোমান্টিকতার চরম নিদর্শন আমরা পাই অসুস্থ পান্নাকে দেখতে আসা অনল বাগচীকে ঘিরে তার দিবাস্বপ্নের মধ্য দিয়ে। বিবাহিত পরিণত বয়স্ক অনিল বাগচীর গলায় পান্না মনে মনে বরমাল্য দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। আবার তাদের রান্নারলোক সুদর্শনের ভূত নামাবার গল্প সে নির্বিচারে বিশ্বাস করেছিল এবং সকলের মধ্যে সানন্দে বিলিয়েছিল। পান্না তার বয়সের ধর্মানুযায়ী আচরণ করেছে। আর সেটা সম্ভবপর হবার পিছনে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে উপন্যাসের প্লটে গ্রামীণ পটভূমিকার ব্যবহার। কারণ শহুরে জীবনের মেকী যান্ত্রিকতা মানুষের সহজ অনুভূতিগুলিকে হত্যা করে মানুষের মানবিক গুণাবলীর বিকাশে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, গ্রাম এখনো যান্ত্রিকতার অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত।

জিজিবুড়ি — আয়ুর শেষ প্রান্তে উপস্থিত দরিদ্র ঘরের কন্যা দরিদ্রের স্ত্রী বাসন্তীর মা জিজিবুড়ি সারাজীবন অসহনীয় অভাব অনটনের সঙ্গে লড়াই করে অত্যন্ত চতুর, শঠ্ রমণীতে পরিণত হয়েছে। আমরা জানি মানুষ যেমন পরিস্থিতির সৃষ্টিকর্তা তেমনি আবার অনেক সময় মানুষ অসহায়ভাবে পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে পড়ে। কৈশোরী লাবণ্যময়ী, সুশীলা রমণী জিজিবুড়ির সংসারে যুপকাষ্ঠে পরে কিভাবে আজকের স্বার্থচিন্তায় মগ্ন, হিসাবী, সংকীর্ণমানসিকতার জিজিবুড়িতে পরিণত হল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখেছেন ধীরেন কাষ্ঠ নিজের চোখে। একটু সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় সে তার মেয়ে বাসন্তীকে তুলে দেয় দ্বোজবর রসিক বাঙালের হাতে। কিন্তু মনের দিক থেকে রসিক বাঙালকে সে জামাই হিসাবে মেনে নিতে পারেনি। অথচ রসিক বাঙালের অন্নেই প্রতিপালিত জিজিবুড়ি। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে সদস্য এই মহিলা সোনার ডিম পারা হাঁস রসিক বাঙালকে সরিয়ে তার সমস্ত সোনার ডিম হস্তগত করার চিন্তায় ব্যস্ত। নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে উচ্চমধ্যবিত্ত উত্তীর্ণ হবার আপ্রাণ প্রয়াসের হীনমানসিকতা নিয়ে জিজিবুড়ি উপন্যাসের ঘটনাবৃত্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মেয়ে বাসন্তীকে কুপরামর্শ দিয়ে প্রতিমুহূর্তে তাকে বিপথে চালনা করে স্বার্থসিদ্ধিতে মগ্ন জিজিবুড়ি বলেছে

''তুই (বাসন্তী) তো দাসীবাঁদী হওয়ার জন্য মুখিয়ে আছিস। ছেলের জন্য যা করলি তা তো দেখলুম। বড়গিন্নি এলে তো তোর আঁচলে পা মুছবে। এখন থেকে একটু মাথা খাটিয়ে চল। ওরা সব বাঙাল দেশের মানুষ, তুই ডালে ডালে চলিস তো ওরা চলে পাতায় পাতায়। তোর অত আদিখ্যেতার দরকার কী? নিজেরটা নিয়ে থাকবি। পারিস তো জমিজমা কিছু আমার বা ভাইদের নামে বেনামী করে দে। তাহলে আর গাপ করতে পারবে না।''[১০০] আমরা জানি মানুষের জীবনের প্রথম শিক্ষক মা। মা-ই সন্তানকে সমগ্র বিপদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং সন্তানকে সুপরামর্শ দিয়ে তার জীবনে চলার পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করে তোলে।

হীনস্বার্থপর জিজিবুড়ি মায়ের এই সুমহান কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। শুরুতেই সে অর্থের লোভে দ্বোজবর রসিক সাহার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। আবার বিয়ের পর ''পৃথিবীকে সে (বাসন্তী) যখন নিজের মতো করে বুঝে নিতে চায় তখনই জিজিবুড়ি এসে তাকে উল্টো কথা শেখায়।''[১০১] মেয়ে জামাই সম্পর্কে অরুচিকর মন্তব্য করতেও জিজিবুড়ি পিছপা হয় না। ''ইঃ বড় যে বেউলো হলি। বলি বাঙাল কি তোর আর জন্মের স্বামী নাকি লা? বে বসছিল লোক দেখাতে, ও মোটে বে-ই নয়। রাঁড়ের মতো আছিস তাই থাকবি। ও তোকে বউ বলে বড় গেরাহ্যি করে কি না। তুই বোকার বেহদ্দ বলে দুধের বদলে পিটুলিগোলা খেয়ে নাচছিস।''[১০২] তার কুশিক্ষা কুমানসিকতার প্রভাব পড়েছে রসিক সাহা ও বাসন্তীর পুত্র মরণের উপর। তারই পরামর্শে মরণ রসিকসাহার সাপ্রাহিক বাজারের ফর্দে মায়ের হাতের লেখা জাল করে জিজিবুড়ির জন্য আফিঙের কথা লিখেছে। রাসিকসাহার প্রথম পক্ষের পুত্র সুমন সম্পর্কে এক রসিকের প্রথম পক্ষের সংসার সম্পর্কে মরণের মনে বিষ ঢেলে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে জিজিবুড়ি।

সারাজীবন ধরে দরিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে কোনরকমে জীবনধারণে অভ্যস্ত জিজিবুড়ির সংকীর্ণ মানসিকতা আরও পরিচয় পাই আমরা রসিকের উদারতার, মানুষকে খাওয়ানোর প্রবল ইচ্ছার তীব্র বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। কথায় বলে 'যে খায় চিনি তাকে জোগায় চিন্তামণি'। চিন্তামণির কৃপাধন্য রসিক সাহা কেবল নিজে খায় অন্য মানুষকে খাওয়াতে ভালোবাসে তাই নয়, ভূতভুজ্যির উদ্দেশ্য সে প্রতিদিন দশ বারোখানা আটার রুটি কাককে খাওয়ায়। রসিকের এই কাজে বিরক্ত হয়ে ''চাপা গলায় জিজিবুড়ি বলে '' ওই চললেন কাককে ভোজ খাওয়াতে। ওই করে করেই ঘটিবাটি সব চাঁটি হবে বলে রাখছি বাপু। শেষে কৌপিন সম্বল। বলি কাকের মতো নিঘিন্নে জীব আছে সারাদিন অখাদ্য সব জিনিস খেয়ে বেড়ায় পচা- ঘচা-বাসি ত্যাগ কোনটায় অরুচি দেখেছিস? কেলেকুষ্টি, ছিষ্টিছাড়া কাককে কেউ নেমন্তন করে পয়সার জিনিস খাওয়ায় আহাম্মক ছাড়া। আড়াইশো তিনশো আটা জলে গেল। কত দাম হয় হিসেব করেছিস কখনও।''[১০৩] কেলেকুষ্টি

ছিষ্টিছাড়া কাক বলে নয় জিজিবুড়ির আপত্তির প্রধান কারণ হিসেব বহির্ভূত খরচ। তাই দরিদ্র খাদ্যরসিক ধীরেন কাষ্ঠকে খাইয়ে রসিক সাহা বাসন্তী পরম আহ্লাদিত হলেও বাসন্তী মা জিজিবুড়ির কুনজরে পরে ধীরেন কাষ্ঠ। ধীরেন কাষ্ঠকে তীব্র বাক্যবাণে জর্জরিত করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না জিজিবুড়ি। অপর দিকে দুই অকাল কুষ্মাণ্ড পুত্রের প্রতি তার অগাধ স্নেহ বর্ষিত হয়েছে। এমনকি বাসন্তী দুই ভাই মিলে রসিক সাহাকে খুন করার চেষ্টা করলেও জিজিবুড়ি নির্বিকার থেকেছে। সব জেনেও সে বাসন্তীর কাছে আর্জি জানিয়েছে ''দেনা ভাই দুটোর একটা গতি করে।''[১০৪] রসিক সাহার কাছে টাকা নিয়ে সে তার পুত্রদের ব্যবসা করে দেবার প্রস্তাব রাখে বাসন্তীর কাছে। বাসন্তী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে দ্বিগুণ রাগে অগ্নিশর্মা হয় জিজিবুড়ি। রাগান্বিত জিজিবুড়ির রসিক সাহার ওপর তীব্র ক্রোধ প্রকাশ পায় রসিক সাহার পুত্র সুমনকে প্ররোচিত করে তার চরিত্রকে কলঙ্কিত করার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। সে গ্রাম্য মেয়ে হিমিকে ঠেলে দেয় সুমনের দিকে। এবং হিমিকে পরামর্শ দেয় সুমনকে শারীরিকভাবে আকৃষ্ট করার যাতে সুমনের পদস্খলন সম্ভব হয়। রসিক সাহার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য জিজিবুড়ি এই ঘৃণ্য মানসিকতা আমাদেরকে হতবাক করে দেয়। উপন্যাসে পুত্রদের প্রতি অহেতুক স্নেহ এবং কন্যা ও জামাইয়ের প্রতি জিজিবুড়ির তীব্র বিরাগপূর্ণ মানসিকতার যে পরিচয় পাই তা নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে নারী মনস্তত্ত্বেরই অনুসারী।

সূত্রনির্দেশ

১। সুমিতা চক্রবর্তী, 'উপন্যাস বহুরূপে', অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন রোড, কলকাতা-০৬, মুদ্রণ ২০১০, পৃঃ ১১৪।

২। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, 'আমার প্রথম বই', শিল্পসাহিত্য পত্রিকা, সম্পাদক - অনিন্দ্য সৌরভ, পৃঃ ৯০।

৩। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, উপন্যাস সমগ্র, প্রথম খণ্ড, 'ঘুণপোকা', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-০৯, পৃঃ ৫।

৪। তদেব, পৃঃ ১৬।

৫। তদেব, পৃঃ ১৬।

৬। তদেব, পৃঃ ১৮।

৭। তদেব, পৃঃ ১৮।

৮। তদেব, পৃঃ ৪৩।

৯। তদেব, পৃঃ ৪৪।

১০। তদেব, পৃঃ ৫৬।

১১। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, 'আমার প্রথম বই', শিল্পসাহিত্য পত্রিকা, পৃঃ ৯০।

১২। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, উপন্যাস সমগ্র, ১ম খণ্ড 'পারাপার', আনন্দ পাবলিশার্স প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৯, পৃঃ ৭৮।

১৩। তদেব, পৃঃ ৭১।

১৪। তদেব, পৃঃ ৬৯।

১৫। তদেব, পৃঃ ৭০।

১৬। তদেব, পৃঃ ৭১।

১৭। তদেব, পৃঃ ৯৫।

১৮। তদেব, পৃঃ ৭৬।

১৯। তদেব, পৃঃ ১১০।

২০। তদেব, পৃঃ ৭৫।

২১। তদেব, পৃঃ ৭৭।

২২। তদেব, পৃঃ ৯৯।

২৩। তদেব, পৃঃ ১৩২।

২৪। তদেব, পৃঃ ১৩২-১৩৩।

২৫। তদেব, পৃঃ ১৩৬।

২৬। তদেব, পৃঃ ১৩৯।

২৭। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র ৪র্থ খণ্ড, 'দূরবীণ' আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯ প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৯, পৃঃ ১৪৭।

২৮। তদেব, পৃঃ ১৫২।

২৯। তদেব, পৃঃ ১৬২।

৩০। তদেব, পৃঃ ১৬৬।

৩১। তদেব, পৃঃ ৩০৪।

৩২। তদেব, পৃঃ ৫০৭।

৩৩। তদেব, পৃঃ ৪৩৬।

৩৪। তদেব, পৃঃ ৭৩০।

৩৫। তদেব, পৃঃ ৬৯৯।

৩৬। তদেব, পৃঃ ৪৯৭।

৩৭। তদেব, পৃঃ ৭২৩।

৩৮। তদেব, পৃঃ ২৩৭।

৩৯। তদেব, পৃঃ ১৯৭।

৪০। তদেব, পৃঃ ২০৪।

৪১। তদেব, পৃঃ ২১৮।

৪২। তদেব, পৃঃ ২২১।

৪৩। তদেব, পৃঃ ২২১।

৪৪। বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ, চণ্ডীদাসের আক্ষেপ অনুরাগ বিষয়ক পদ।

৪৫। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র ৪র্থ খণ্ড, 'দূরবীণ' আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯ প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৯, পৃঃ ৪০৯।

৪৬। তদেব, পৃঃ ৪২১।

৪৭। তদেব, পৃঃ ১৫৯।

৪৮। তদেব, পৃঃ ২৯৫।

৪৯। তদেব, পৃঃ ২৯৭।

৫০। তদেব, পৃঃ ৪২৬।

৫১। তদেব, পৃঃ ৪২৭।

৫২। তদেব, পৃঃ ৪২৭।

৫৩। তদেব, পৃঃ ২৩৭।

৫৪। তদেব, পৃঃ ৪৭১।

৫৫। তদেব, পৃঃ ৪৭২।

৫৬। তদেব, পৃঃ ৫৩১।

৫৭। 'সকালবেলা' সংবাদপত্র ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১০, শিলচর সংখ্যা পৃঃ ৮।

৫৮। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৫ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত উপন্যাস সমগ্র, 'মানব জমিন' উপন্যাসের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৪।

৫৯। তদেব, পৃঃ ২৮৬।

৬০। তদেব, পৃঃ ৫৭২।

৬১। তদেব, পৃঃ ৫৭৪।

৬২। তদেব, পৃঃ ৭২৮।

৬৩। তদেব, পৃঃ ৫২৭।

৬৪। তদেব, পৃঃ ৬৮২।

৬৫। তদেব, পৃঃ ৩০৬।

৬৬। তদেব, পৃঃ ৩০৩।

৬৭। তদেব, পৃঃ ৪৩৫।

৬৮। তদেব, পৃঃ ৫৪৩।

৬৯। তদেব, পৃঃ ৪৭৮।

৭০। তদেব, পৃঃ ৫৩৯।

৭১। তদেব, পৃঃ ২৭৭-২৭৮।

৭২। তদেব, পৃঃ ৪২৪।

৭৩। তদেব, পৃঃ ৪২৭।

৭৪। তদেব, পৃঃ ৫৫৪।

৭৫। তদেব, পৃঃ ৫৫৬।

৭৬। তদেব, পৃঃ ৬১৯।

৭৭। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় রচিত 'পার্থিব' উপন্যাস, আনন্দ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত উপন্যাস সমগ্র, পৃঃ ৩১৮।

৭৮। তদেব, পৃঃ ৭১।

৭৯। তদেব, পৃঃ ১০০।

৮০। তদেব, পৃঃ ৬৫৬।

৮১। তদেব, পৃঃ ২৮।

৮২। তদেব, পৃঃ ২৯।

৮৩। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় রচিত 'চক্র' উপন্যাস, আনন্দ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত উপন্যাস সমগ্র, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৬, পৃঃ ১১৭।

৮৪। তদেব, পৃঃ ১৫।

৮৫। তদেব, পৃঃ ১৫।

৮৬। তদেব, পৃঃ ২৩।

৮৭। তদেব, পৃঃ ১০০।

৮৮। তদেব, পৃঃ ১০০।

৮৯। তদেব, পৃঃ ৫০১।

৯০। তদেব, পৃঃ ৩৯৩।

৯১। তদেব, পৃঃ ১৯২।

৯২। ঠাকুর শ্রীশ্রী অনুকূল চন্দ্রের 'নারীর নীতি' গ্রন্থের 'পতিপ্রেমের কষ্টি পাথর' শীর্ষক পদ, পৃঃ ১৪৮।

৯৩। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় রচিত 'চক্র' উপন্যাস, আনন্দ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত উপন্যাস সমগ্র, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৬, পৃঃ ১৭৩।

৯৪। তদেব, পৃঃ ৮২।

৯৫। তদেব, পৃঃ ১৭২।

৯৬। তদেব, পৃঃ ৬৫।

৯৭। তদেব, পৃঃ ১১৭।

৯৮। তদেব, পৃঃ ১১৫।

৯৯। তদেব, পৃঃ ১১৭।

১০০। তদেব, পৃঃ ২৯৬।

১০১। তদেব, পৃঃ ২৯৬।

১০২। তদেব, পৃঃ ১৭৫।

১০৩। তদেব, পৃঃ ১৭৪।

১০৪। তদেব, পৃঃ ৩৫১।